সূচীপত্র

সাপ্তাহিক আরাফাত

মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৭ বর্ষ | সংখ্যা: ৩৭-৩৮
০৬ জুলাই ২০২৬, সোমবার

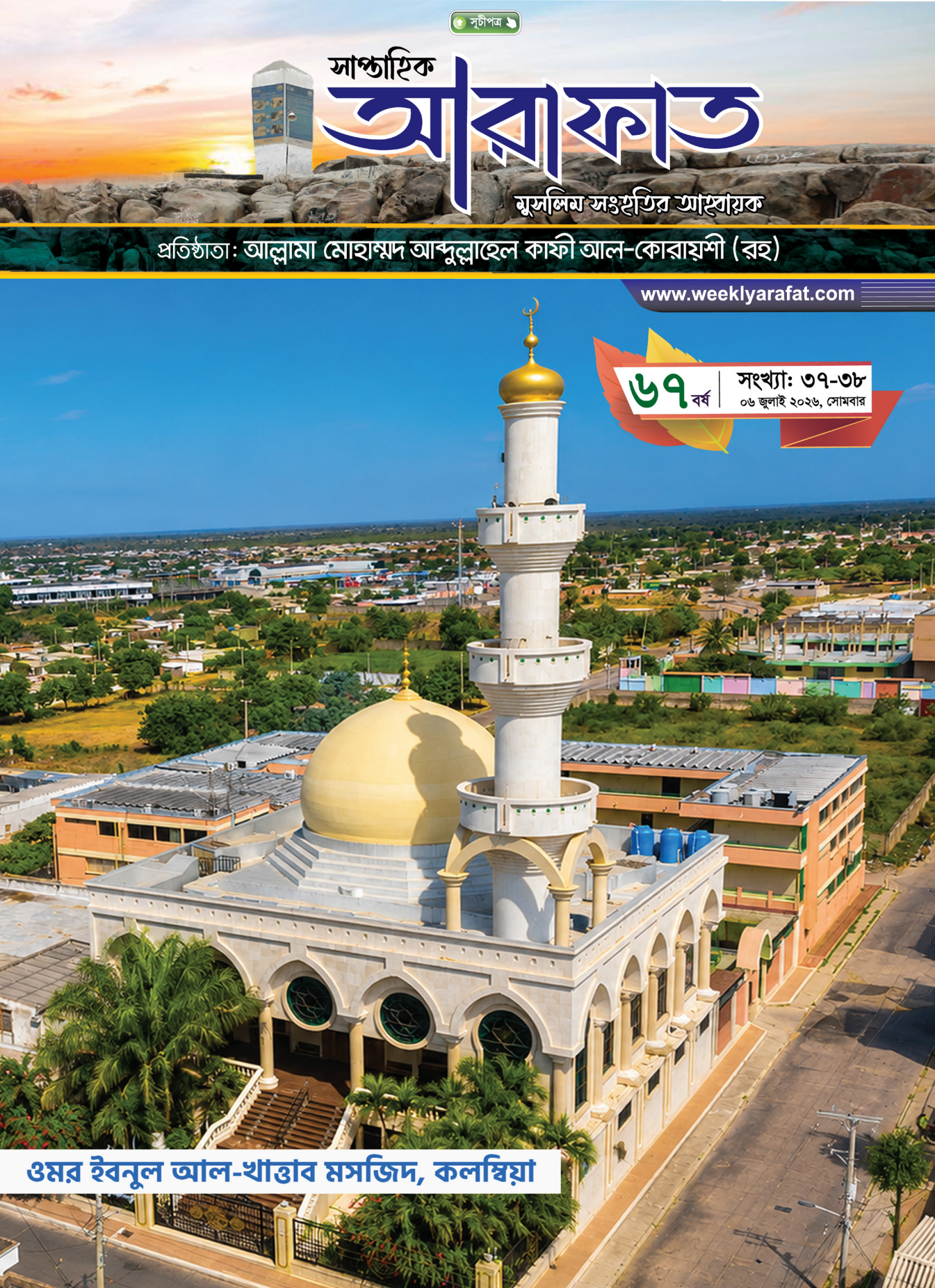

ওমর ইবনুল আল-খাত্তাব মসজিদ, কলম্বিয়া

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক
রেজি - ডি.এ. ৬০

مجلة عرفات الأسبوعية
تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش
٩٨. نواب فور، داكا-١١٠٠
الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)
الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة
الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)
الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:
الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)
رئيس التحرير:الأستاذ/محمد أسد الإسلام

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জামানত বাবদ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রিম ১০০/- (একশত) টাকা পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৪ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে প্রতি ২৫ কপির জন্য ১ কপি, ৫০ কপির জন্য ২ কপি এবং ৭৫ কপির জন্য ৩ কপি করে সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ / বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নম্বরে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

জমঈয়ত কল্যাণ ফান্ড
শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর- ৪০০৯১১১০০০১২২১৪

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিকাশ নম্বর ০১৯৩৩৩৫৫৯০৫ চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

বাংলাদেশ
বার্ষিক : ৭০০ টাকা
ষান্মাসিক : ৩৫০ টাকা

মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
আন্তর্জাতিক
মহাসম্মেলন -২০২৬

০৫ ও ০৬ নভেম্বর
বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার

জমঈয়ত ক্যাম্পাস, কাইচাবাড়ি রোড
বাইপাইল (ইপিজেড সংলগ্ন), আশুলিয়া, ঢাকা

সভাপতিত্ব করবেন **অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক** সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা মাশায়েখ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, বরেণ্য উলামায়ে কিরাম ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নেতৃবৃন্দ

দেখতে চোখ রাখুন-
Bangladesh Jamiyat Ahl-Al-Hadith

The weekly Arafat
সাপ্তাহিক
আরাফাত
عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
মুসলিম সংস্কৃতির আহ্বায়ক
ধর্ম-দর্শন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫৭
রেজি. ডি.এ. ৬০
বর্ষ ৬৭
সোমবার

৩৭-৩৮ সংখ্যা
০৬ জুলাই-২০২৬ ঈসায়ী
২২ আষাঢ়-১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
২০ মুহার্‌রম-১৪৪৮ হিজরি
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সূচিপত্র

- মণির খনি– সফরের শরঈ নির্দেশনা ০২
- সম্পাদকীয়– জমঈয়ত: দাওয়াহ থেকে জনকল্যাণ অগ্রযাত্রার অবিচল পথ ০৪
- দারসুল কুরআন– স্রষ্টার সত্তায় সৃষ্টির কোনো অংশ নেই: সমকালীন শির্কের ব্যবচ্ছেদ
  আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৬
- দারসুল হাদীস– শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড: তাক্বওয়া ও আল্লাহভীতি
  গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক- ১১
- প্রধান রচনা– ইখতিলাফের আদব ও দলাদলি থেকে মুক্তির উপায়: তাত্ত্বিক ও প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ
  মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম- ১৫
- ইসলামী প্রবন্ধ: চূড়ান্ত বিজয় মুসলিমদেরই
  মোহাম্মদ ওমর ফারুক রানা- ১৯
- শিক্ষা ও সভ্যতা– ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার আন্তঃসম্পর্ক: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা
  আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ২১
- ক্বাসাসুল কুরআন: ক্ষুদে গোয়েন্দা হুদহুদ
  আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২২
- সাময়িক প্রসঙ্গ: বিশ্বকাপের উন্মাদনা নাকি ঈমানের অবক্ষয়?
  মো. রেদুয়ান বিন রফিকুল ইসলাম- ২৩
- মহিলা জগত: কুরআন হাদীসের আলোকে নারীদের মসজিদে সালাত আদায়ের বিধান
  আবু আব্দুল্লাহ জনি আহমাদ- ২৫
- ভ্রান্ত মতবাদ: "হুসাইনী ব্রাহ্মণ" এক ব্যাতিক্রম সম্প্রদায়
  আহমাদ বিন আব্দুস সালাম- ২৯
- জমঈয়ত সংবাদ ৩২
- ফাতাওয়া ও মাসায়িল ৩৭
- প্রচ্ছদ পরিচিতি– কলম্বিয়ান মুসলিমদের মিলনস্থল মসজিদ 'উমার
  আবু ফাইয়ায জি. রহমান- ৪৮

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া নূরী
অধ্যাপক আহমদ আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

সহকারী সম্পাদক
শাইখ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী
হাফেয ড. সোহেল আহমাদ মাদানী

সার্কুলেশন ম্যানেজার : ডা. সুলতান আহমদ

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
ড. ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী
মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক

ব্যবস্থাপক : রবিউল ইসলাম
বিপণন কর্মকর্তা : মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মো: আনোয়ার হোসাইন ও নূর ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ: জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
নির্বাহী সম্পাদক: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭, বিপণন কর্মকর্তা: ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, কম্পিউটার বিভাগ: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭,
টেলিফোন: +৮৮ ০২ ২২৪৪৫৮৫৫১, **weeklyarafat@gmail.com, www.weeklyarafat.com, www.jamiyat.org.bd.com, Page: f/shaptahikArafat,f/groups/weeklyarafat**

منجم جواهر / মণির খনি– সফরের শরঈ নির্দেশনা

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী

❁ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "সফর কষ্টের (আযাবের) একটি অংশ। এটি মানুষের ঘুম, খাবার ও পানীয়ে ব্যাঘাত ঘটায়। তাই তোমাদের কেউ যখন সফরের উদ্দেশ্য পূর্ণ করবে, তখন সে যেন দ্রুত তার পরিবারের কাছে ফিরে আসে।" *(সহীহ আল-বুখারী- হ. ১৮০৪, ৩০০১; সহীহ মুসলিম- হা. ১৯২৭)*

❁ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيْرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ. وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ، اللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ، وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ. وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ، وَزَادَ فِيْهِنَّ: «آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ، عَابِدُوْنَ، لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন সফরে বের হওয়ার জন্য তাঁর বাহনে আরোহণ করে ভালোভাবে বসতেন, তখন তিনি তিনবার "আল্লাহু আকবার" বলতেন। এরপর বলতেন: "পবিত্র তিনি, যিনি এ বাহনকে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন; আমরা নিজেরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আর নিশ্চয়ই আমরা আমাদের রবের কাছেই ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমাদের এ সফরে আমরা আপনার কাছে নেকি,

অনন্তর মহান আল্লাহর বাণী

❁ ﴿وَ اِذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْاَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ ۖ اِنْ خِفْتُمْ اَنْ یَّفْتِنَكُمُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا ؕ اِنَّ الْكٰفِرِیْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِیْنًا﴾

"আর যখন তোমরা ভূপৃষ্ঠে ভ্রমণ কর তখন সালাত সংক্ষেপ করলে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই, যদি তোমরা আশংকা করো যে, যারা অবিশ্বাসী তারা তোমাদেরকে বিব্রত করবে; নিশ্চয়ই কাফিরেরা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" *(সূরা আন্-নিসা: ১০১)*

❁ ﴿قُلْ سِیْرُوْا فِی الْاَرْضِ ثُمَّ انْظُرُوْا كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِیْنَ﴾

"তুমি বলো: তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করো, অতঃপর সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণাম কি হয়েছে তা গভীর অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করো।" *(সূরা আল-আন'আম: ১১)*

❁ ﴿قُلْ سِیْرُوْا فِی الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَیْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ یُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ﴾

"বলো: পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করো এবং অনুধাবন করো কিভাবে তিনি সৃষ্টি শুরু করেছেন? অতঃপর আল্লাহ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন পরবর্তী সৃষ্টি। আল্লাহতো সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।" *(সূরা আল-'আনকাবূত: ২০)*

❁ ﴿هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِیْ مَنَاكِبِهَا وَ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ؕ وَ اِلَیْهِ النُّشُوْرُ﴾

"তিনিইতো তোমাদের জন্য ভূমিকে সুগম করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা দিক-দিগন্তে বিচরণ করো এবং তাঁর প্রদত্ত জীবনোপকরণ হতে আহার্য গ্রহণ করো; পুনরুত্থানতো তাঁরই নিকট।" *(সূরা আল-মুলক: ১৫)*

❁ ﴿اَفَلَمْ یَسِیْرُوْا فِی الْاَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ یَّعْقِلُوْنَ بِهَاۤ اَوْ اٰذَانٌ یَّسْمَعُوْنَ بِهَا ۚ فَاِنَّهَا لَا تَعْمَی الْاَبْصَارُ وَ لٰكِنْ تَعْمَی الْقُلُوْبُ الَّتِیْ فِی الصُّدُوْرِ﴾

"তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞান বুদ্ধি সম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারত। বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়; বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়।" *(সূরা আল-হাজ্জ: ৪৬)*

তাক্বওয়া এবং এমন ‘আমল প্রার্থনা করি, যা আপনি পছন্দ করেন। হে আল্লাহ! আমাদের এ সফর সহজ করে দিন এবং এর দূরত্ব আমাদের জন্য সংক্ষিপ্ত করে দিন। হে আল্লাহ! সফরে আপনিই আমাদের সঙ্গী এবং পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে আপনিই আমাদের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় চাই সফরের কষ্ট, দুঃখজনক দৃশ্য এবং ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কাছে অকল্যাণকর অবস্থায় ফিরে আসা থেকে।”

আর যখন তিনি সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন একই দু‘আ পড়তেন এবং এর সঙ্গে যোগ করতেন: “আমরা প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাহ্কারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের রবের প্রশংসাকারী।” *(সহীহ মুসলিম- হা. ১৩৪২; সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৫৯৯; জামি‘ আত্-তিরমিযী- হা. ৩৪৪৬)*

❁ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ (رضي الله عنهما)، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ، مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ.

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবী (ﷺ) বলেছেন: “মানুষ যদি একাকীত্বের (বিশেষত সফরে একা থাকার) ক্ষতি সম্পর্কে আমি যা জানি তা জানত, তবে কোনো আরোহী কখনো রাতের বেলা একা সফর করত না।” *(সহীহ আল-বুখারী- হা. ২৯৯৮)*

❁ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رضي الله عنه)، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ: «إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ، فَلْيُؤَمِّرُوْا أَحَدَهُمْ.

আবূ সা‘ঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: “যখন তিনজন ব্যক্তি সফরে বের হবে, তখন তারা যেন তাদের মধ্য থেকে একজনকে আমীর (নেতা) নিযুক্ত করে।” *(সুনান আবূ দাউদ- হা. ২৬০৮)*

❁ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا﴾ فَقَدْ أَمِنَ النَّاسُ؟ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ.

ইয়া’লা ইবনু ‘উমাইয়াহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি ‘উমার ইবনু আল-খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললাম, “আল্লাহ তা‘আলা তো বলেছেন: ‘তোমরা যদি আশঙ্কা করো যে কাফিররা তোমাদের কষ্ট দেবে, তবে সালাত সংক্ষিপ্ত (কসর) করলে তোমাদের কোনো গুনাহ নেই।’ *(সূরা আন্-নিসা: ১০১)*

কিন্তু এখন তো মানুষ নিরাপদে আছে (তাহলে কেন কসর করা হয়)?” তিনি বললেন, “তুমি যে বিষয়ে বিস্মিত হয়েছ, আমিও সে বিষয়েই বিস্মিত হয়েছিলাম। তাই আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন: ‘এটি এমন একটি সাদাক্বাহ্ (অনুগ্রহ), যা আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের প্রতি দান করেছেন। সুতরাং তোমরা তাঁর এই সাদাক্বাহ্ গ্রহণ করো’।” *(সহীহ মুসলিম- হা. ৬৮৬; সুনান আবূ দাউদ- হা. ১১৯৯)*

❁ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضي الله عنه) قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ)، فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: “আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে সফর করতাম। তখন সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি সিয়াম না-রাখা ব্যক্তিকে দোষ দিত না এবং সিয়াম না-রাখা ব্যক্তিও সিয়াম পালনকারীকে দোষ দিত না।” *(সহীহ আল-বুখারী- হা. ১৯৪৭; সহীহ মুসলিম- কিতাবুস সিয়াম, হা. ১১১৮)*

❁ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ (رضي الله عنه): أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ، فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ.

কা‘ব ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন কোনো সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম মসজিদে যেতেন। সেখানে দুই রাকাআত সালাত আদায় করতেন। এরপর লোকদের সঙ্গে বসতেন। *(সহীহ আল-বুখারী- হা. ৩০৮৮; সহীহ মুসলিম- কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন, হা. ৭১৬)*

افتتاحية / সম্পাদকীয়

জমঈয়তঃ দাওয়াহ থেকে জনকল্যাণের পথে অবিরাম অভিযাত্রা

একটি আদর্শ কেবল বিশ্বাসে নয়, কর্মে বেঁচে থাকে; আর একটি আন্দোলনের প্রাণ নিহিত থাকে তার সুসংগঠিত অভিযাত্রায়। তাওহীদ ও সহীহ সুন্নাহর বিশুদ্ধ দাওয়াহ মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়া এবং কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের প্রত্যয়ে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই নীরবে, নিরলসভাবে এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা মতো কাজ করে যাচ্ছে। ব্যক্তি থেকে পরিবার, পরিবার থেকে সমাজ এবং সমাজ থেকে রাষ্ট্র-জীবনের প্রতিটি স্তরে ইসলামের নির্মল শিক্ষা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠনটির পদচারণা আজ আরো সুদৃঢ় ও সুসংহত।

সালাফে সালেহীনের মানহাযকে ভিত্তি করে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর নিঃশর্ত অনুসরণ, অন্ধ তাকলীদ পরিহার এবং দলিলভিত্তিক ইজতিহাদের ধারা অব্যাহত রাখাই এ সংগঠনের আদর্শিক বৈশিষ্ট্য। এই চেতনাকে ধারণ করেই 'আক্বীদাহ্'র বিশুদ্ধতা, ইবাদতের শুদ্ধতা, শির্ক, কুফর ও বিদআতমুক্ত সমাজ নির্মাণ, শিক্ষা, তারবিয়াহ, দাওয়াহ এবং মানবকল্যাণকে একই সূত্রে গেঁথে এগিয়ে চলছে এর কর্মসূচী।

যে কোনো আদর্শিক আন্দোলনের শক্তি সুশৃঙ্খল সংগঠন, দূরদর্শী পরিকল্পনা এবং আদর্শনিষ্ঠ কর্মীবাহিনী। এই সত্যকে সামনে রেখেই বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস সাম্প্রতিক সময়ে সাংগঠনিক কার্যক্রমে নতুন গতি সঞ্চার করেছে। দাওয়াহ ও মাহফিলকেন্দ্রিক কার্যক্রমের গণ্ডি অতিক্রম করে এখন সংগঠন এগোচ্ছে আরো প্রাতিষ্ঠানিক, পরিকল্পিত ও ফলপ্রসূ সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনার পথে।

দেশকে চারটি সাংগঠনিক অঞ্চলে বিন্যস্ত করে প্রতিটি অঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য, নিয়মিত সফর, তদারকি, মূল্যায়ন এবং পর্যায়ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে সংগঠনের প্রতিটি স্তরে জবাবদিহিতা, সমন্বয় ও কর্মদক্ষতা নতুন মাত্রা লাভ করেছে। পাশাপাশি জেলা, উপজেলা ও স্থানীয় পর্যায়ে কাঠামো গঠন, পুনর্গঠন এবং নতুন শাখা সম্প্রসারণের মাধ্যমে তৃণমূলে সংগঠনের ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হচ্ছে।

সাংগঠনিক অগ্রযাত্রার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কর্মী গঠন ও নেতৃত্বের বিকাশ। ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব কোনো সম্মানের আসন নয়; এটি মহান আল্লাহর অর্পিত এক মহান আমানত। তাই ব্যক্তিগত পরিচয় বা আনুষ্ঠানিক সুপারিশের পরিবর্তে তাক্বওয়া, আমানতদারিতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, যোগ্যতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই নেতৃত্ব নির্বাচনের প্রধান মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

এই উপলব্ধির ধারাবাহিকতায় নিয়মিত প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টেশন, সাংগঠনিক সেশন ও দাওয়াহভিত্তিক কর্মসূচির মাধ্যমে এমন এক কর্মীবাহিনী গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে, যারা কেবল বক্তৃতার মঞ্চে নয়; বরং চরিত্র, কর্ম ও ত্যাগের মাধ্যমে আদর্শের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠবে ইন্ শা-আল্লাহ।

সংগঠনটির কার্যক্রম কেবল দাওয়াহর পরিসরেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানবকল্যাণের বিস্তৃত অঙ্গনেও এর পদচিহ্ন সুস্পষ্ট। কর্যে হাসানাহ প্রকল্প, অসচ্ছল পরিবারের আর্থিক সহায়তা, নওমুসলিমদের পুনর্বাসন, দুর্যোগকালীন ত্রাণ, সুপেয় পানির জন্য নলকূপ স্থাপনসহ বহুমুখী সেবামূলক উদ্যোগ সমাজের প্রান্তিক মানুষের পাশে এক আন্তরিক সহচর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রেও রয়েছে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি। আহলে হাদীস মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড পরিচালনা, ইয়াতীমখানা, মাদ্‌রাসা ও মক্তব প্রতিষ্ঠা, শিক্ষক, ইমাম ও দাঈ প্রশিক্ষণ, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ এবং ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী

ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দ্বীনি ও আধুনিক জ্ঞানের সমন্বিত শিক্ষায় সমৃদ্ধ করার প্রত্যয়ের বহিঃপ্রকাশ। পাশাপাশি বিশ্বমানের জামিআ আরাবিয়া, কারিগরি কলেজ, ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনাও এগিয়ে চলছে।

স্বাস্থ্যসেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পরিচালিত হচ্ছে দাতব্য চিকিৎসাকেন্দ্র। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় রয়েছে আধুনিক ডায়াগনস্টিক ল্যাব, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা- যা মানবসেবাকে আরো প্রাতিষ্ঠানিক ও টেকসই রূপ দেবে ইন্ শা-আল্লাহ।

দাওয়াহ ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও সংগঠনটি বহুমাত্রিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ফাতাওয়া ও গবেষণা, ইসলামী গ্রন্থ প্রকাশ, আধুনিক প্রিন্টিং প্রেস প্রতিষ্ঠা, সাপ্তাহিক আরাফাত ও মাসিক তর্জুমানুল হাদীস প্রকাশ, অনলাইন ও অফলাইন দাওয়াতী কার্যক্রম, মসজিদভিত্তিক ইসলামী দাওয়াহ সেন্টার প্রতিষ্ঠা, শিশু ও বয়স্কদের জন্য বিশেষ মক্তব, মহিলাদের দ্বীনি শিক্ষা ব্যবস্থা এবং দেশ-বিদেশের আলেমদের সঙ্গে জ্ঞানবিনিময় ও সহযোগিতার মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ বার্তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

নিঃসন্দেহে এসব উদ্যোগ বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাংগঠনিক অভিযাত্রায় এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। পরিকল্পিত কর্মপদ্ধতি, প্রাতিষ্ঠানিক দৃষ্টিভঙ্গি, তাক্বওয়াভিত্তিক নেতৃত্ব, দক্ষ কর্মী গঠন এবং শিক্ষা, দাওয়াহ, মানবসেবা ও সমাজ সংস্কারের সমন্বিত কর্মধারা সংগঠনটিকে এক শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করছে।

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিকে একমাত্র লক্ষ্য করে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিকে গড়ে তোলার এই পথচলা ইন্ শা-আল্লাহ আগামী দিনগুলোতে আরো সম্প্রসারিত হবে ইন্ শা-আল্লাহ। বিশুদ্ধ ইসলামের দাওয়াহ, নৈতিক সমাজ বিনির্মাণ এবং উম্মাহর সার্বিক কল্যাণে সংগঠনটি আরো কার্যকর ও সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রাখবে- এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

আসুন, আমরা সবাই এই মহৎ অভিযাত্রার সহযাত্রী হই। দ্বীনের খেদমত, জ্ঞানচর্চা, মানবসেবা এবং ন্যায়, সত্য ও কল্যাণভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখি। আল্লাহ তা'আলা বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের এই অগ্রযাত্রাকে কবুল করুন –আমীন।

আল্লামা মোহাম্মদ 'আবদুল্লাহিল ক্বাফী আল কুরায়শী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন

দা'ওয়াত ব্যতীত সংস্কার সম্ভব নয়, আবার প্রামাণ্য দলিল ব্যতীত দা'ওয়াত সম্ভব নয়, আর তাকলীদের পাশাপাশি দলিল অকার্যকর। সুতরাং অন্ধ তাকলীদের দ্বার রুদ্ধ এবং ইজতিহাদের দ্বার উন্মুক্ত করাই হবে সকল সংস্কার আন্দোলনের গোড়ার কথা।

আহলে হাদীস নির্দিষ্ট কোনো দল বা ফির্কার নাম নয়, প্রত্যুত ফির্কাপরস্তী ও দলবন্দীর নিরসনকল্পে এবং বিচ্ছিন্ন মুসলিম সমাজকে এক ও অভিন্ন মহাজাতিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম পরিচালনা করার জন্যই এটার উত্থান হয়েছে। *[আহলে হাদীস পরিচিতি]*

درس القرآن / দারসুল কুরআনঃ

স্রষ্টার সত্তায় সৃষ্টির কোনো অংশ নেই: সমকালীন শির্কের ব্যবচ্ছেদ

আবু সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ*

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا وَّ السَّمَآءَ بِنَآءً ۖ وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الثَّمَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۚ فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

সরল বাংলায় আনুবাদ

"যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা ও আকাশকে ছাদস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর তার দ্বারা তিনি তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন, অতএব জেনে-বুঝে তোমরা তাঁর (আল্লাহর) সমকক্ষ স্থীর করো না।"[১]

শাব্দিক অনুবাদ

اَلَّذِيْ -যে/যিনি, جَعَلَ -তৈরি করেছেন, لَكُمُ -তোমাদের জন্য, الْاَرْضَ -পৃথিবীকে, فِرَاشًا -বিছানার মতো করে, وَّ -আর/এবং, السَّمَآءَ -আকাশকে, بِنَآءً -ছাদস্বরূপ, وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ -আর আকাশ থেকে তিনি অবতীর্ণ করেন, مَآءً -পানি, فَاَخْرَجَ -অতঃপর তিনি বের করলেন, بِهٖ -তার মাধ্যমে, مِنَ -হতে/থেকে, الثَّمَرٰتِ -ফলসমূহ, رِزْقًا -রিযক হিসেবে, فَلَا تَجْعَلُوْا -সুতরাং তোমরা সাব্যস্ত করো না, لِلّٰهِ -আল্লাহর জন্য, اَنْدَادًا -প্রতিদ্বন্দ্বী, وَّ اَنْتُمْ -আর তোমরা, تَعْلَمُوْنَ -তোমরা জানো।

সূরা ও আয়াতের পরিচয়

দারসে উল্লেখিত আয়াতটি মহাগ্রন্থ আল-কুরআনুল কারীমের দ্বিতীয় সূরা, সূরা আল-বাক্বারাহ্'র ২২ নং আয়াত।

বিষয়বস্তু ও প্রেক্ষাপট

তৎকালীন আরব মুশরিকরা মহাবিশ্বের সৃষ্টি, রিযিকদাতা ও পরিচালনাকরী হিসেবে একমাত্র আল্লাহকেই স্বীকার করত; কিন্তু ইবাদত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন মূর্তি ও উপাস্যকে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার মাধ্যম বা শরিকরূপে (অংশীদাররূপে) গ্রহণ করত। ফলে তারা 'তাওহীদে উলূহিয়্যাহ' তথা একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদত নির্দিষ্ট করার নীতিকে লঙ্ঘন করেছিল। এই আয়াতে আল্লাহ তাদের এই স্ববিরোধী বিশ্বাসের যৌক্তিক অসারতা তুলে ধরেছেন। যখন সৃষ্টি, রিযিকদান ও বিশ্ব পরিচালনায় আল্লাহর কোনো অংশীদার নেই, তখন ইবাদত, দু'আ, আনুগত্য ও সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রেও অন্য কাউকে তাঁর সমকক্ষ বা শরীক সাব্যস্ত করা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক। এভাবেই আয়াতটি তাওহীদের যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ উপস্থাপন করে এবং শির্কের অসারতাকে সুস্পষ্টভাবে খণ্ডন করে।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

﴿الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ فِرَاشًا﴾

'যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানাস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন।' এটি পূর্ববর্তী আয়াত اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ মধ্যস্থিত الَّذِيْ-এর সাথে সম্পর্কিত। উভয় বিবরণেই রয়েছে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বিশেষণ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন এরূপ বলছেন, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো, যিনি তোমাদের স্রষ্টা, তোমাদের পূর্ববর্তীগণেরও স্রষ্টা, তোমাদের জন্য তিনি পৃথিবীকে বিছানাস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন। আর এর দ্বারা এ উদ্দেশ্য করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য পৃথিবীকে শয্যা, বিচরণ ক্ষেত্র ও এমন অবস্থান ক্ষেত্র করে দিয়েছেন যাতে অবস্থান করা সম্ভবপর হয়। অনুরূপ অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

﴿الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ سَلَكَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا وَّ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً ۭ فَاَخْرَجْنَا بِهٖٓ اَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتّٰى﴾

"যিনি এ পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানারূপে বানিয়েছেন এবং এতে তোমাদের জন্য অনেক পথও করে দিয়েছেন। আর তিনি আকাশ হতে পানি অবতীর্ণ (বর্ষণ) করেছেন, এর মাধ্যমে আমরা (আল্লাহ) বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদের জোড়া উৎপন্ন করেছি।"[২] তিনি আরো বলেন,

﴿الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ فِيْهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ﴾

"যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানারূপে সৃষ্টি করেছেন এবং এতে তোমাদের জন্য বহু পথ বানিয়েছেন যাতে তোমরা সঠিক পথের সন্ধান পাও।"[৩]

---

* *এম.ফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।*

[১] *সূরা আল-বাক্বারাহ: ২২।*

[২] *সূরা ত্ব-হা: ৫৩।*

[৩] *সূরা আয-যুখরুফ: ১০।*

আর মহান প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলা তাঁর এ বাণীর মাধ্যমে তাঁর নিয়ামতরাজি ও অনুপম অনুগ্রহের আধিক্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যেন সকলে তাদের নিকট বিদ্যমান তাঁর নিয়ামতরাজির কথা স্মরণকরতঃ তাঁর আনুগত্যের প্রতি মনোযোগী হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾

"আর তোমরা আল্লাহর নিয়ামতকে গণনা করে শেষ করতে পারবে না। নিশ্চই মানুষ অধিক অত্যাচারি ও অকৃতজ্ঞ।"[৪]

অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

"আর যদি তোমরা আল্লাহর নিয়ামতকে গণনা করো তবে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম করুণাময়।"[৫]

একটি সুক্ষ্ম প্রশ্ন ও তার জবাব: আমরা জানি পৃথিবী একটি গ্রহ। এটা বিছানার মতো সমতল নয়; বরং বক্র বা গোলাকার। কেউ যদি সাগরে কোনো জাহাজকে দূরে যেতে দেখে, দেখবে সেটি হঠাৎ গায়েব না হয়ে আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। এটি এ কথা প্রমাণ করে যে, পৃথিবী বক্র বা গোলাকার। অথচ, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পৃথিবীকে বিছানাস্বরূপ বলেছেন। এর কারণ বা যুক্তিকতা কি? উত্তরে বলা যায়, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর গঠন-প্রকৃতি ও আকার-আকৃতি নিয়ে আলোচনা করেননি; বরং তিনি এখানে মানবজীবনে পৃথিবীর প্রয়োজনীয়তা ও পৃথিবীতে সৃষ্ট নিয়ামতরাজির প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিশেষজ্ঞগণের মতে, এটি পৃথিবীর সামগ্রিক আকৃতি বোঝাতে নয়; বরং বিশাল এই পৃথিবীর পৃষ্ঠতল মানুষের বসবাসের জন্য কতটা সমতল ও আরামদায়ক করে তৈরি করা হয়েছে, তা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। আর এটাই বাস্তব যে, পৃথিবী গোল হওয়া সত্ত্বেও এর বিশাল আকৃতির কারণে প্রত্যেক জনপদের মানুষের দৃষ্টিতে পৃথিবীটা তার জন্য বিছানার মতোই মনে হয়। তাই আল্লাহ তা'আলা এখানে প্রত্যেক জনপদের মানুষের কাছে তাদের দৃষ্টিতে পৃথিবীর সাদৃশ্য বিছানার মতো বলে উল্লেখ করেছেন।

﴿وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً﴾

'এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন।'

ব্যাখ্যা: অনুরূপ বক্তব্য রয়েছে সূরা আল-মু'মিন-এর ৬৪ নং আয়াতেও। এখানে 'ছাদ' বলতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে বোঝানো হয়েছে। এই বক্তব্যটি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, একটি দালানের ছাদ যেমন তার নিচে বসবাসকারীদের নিরাপত্তা বিধান করে তেমনি নিখিল বিশ্বের দূরবর্তী বিভিন্ন অংশগুলোর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আসমানসমূহ আমাদের এই পৃথিবীর নিরাপত্তা বিধান করে। যারা জ্যোর্তিবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করেন তারা জানেন, পৃথিবীর চেয়েও অনেক বড় বড় বস্তু পৃথিবীর সবদিক দিয়ে নিজ নিজ কক্ষপথে মহাশূণ্যে সন্তরণ করে। আর এরা পৃথিবীর স্থিতি ও নিরাপত্তাকে বিভিন্নভানে নিশ্চিত করেছে। সুতরাং এটি নিশ্চিত যে, আকাশ একটি সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত আচ্ছাদন হিসেবে কাজ করে, যা ক্ষতিকর মহাজাগতিক রশ্মি, উল্কাপিণ্ড এবং চরম তাপমাত্রা থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে। অতঃপর যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে তখন পৃথিবীর নিরাপত্তাও বিঘ্নিত হবে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ﴾

"যখন আকাশ ফেটে যাবে এবং তারকারাজী খসে পড়বে।"[৬]

﴿وَّأَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً﴾

'আর তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন।'

ব্যাখ্যা: এই পানিই জীবনের মূল উৎস। সৃষ্টির শুরু থেকে উদ্ভিদ ও ফসলের বেঁচে থাকা এবং বৃদ্ধির জন্য পানি অপরিহার্য। এখানে এই বাক্যের গঠন রীতিতে এমনটি বুঝার কোনো কারণ নেই যে, মেঘমালার মাধ্যম ছাড়াই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণের কথা এখানে বলা হয়েছে; বরং সাধারণ পরিভাষায় ওপর থেকে আসা সকল বস্তুকেই 'আকাশ থেকে অবতীর্ণ' বলে উল্লেখ করা হয়, তাই এখানে এরূপ বলা যুক্তিযুক্ত হয়েছে। তাছাড়া কুরআনুল কারীমের অনেক স্থানেই মেঘ থেকে পানি বর্ষণের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। যেমন- আল্লাহ তা'আলা প্রশ্নাকারে বলেছেন,

﴿ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ﴾

অর্থাৎ- "শ্বেত-শুভ্র মেঘমালা থেকে বৃষ্টির পানি কি তোমরা বর্ষণ করেছ, না আমি বর্ষণকারী?"[৭] অন্যত্র তিনি বলেন,

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَآءً ثَجَّاجًا﴾

"আমি পরিপূর্ণ মেঘ থেকে প্রবাহিত পানি বর্ষণ করেছি।"[৮]

﴿فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ﴾

'অতঃপর তার দ্বারা তিনি তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেছেন।'

ব্যাখ্যা: এ আয়াতাংশে فَأَخْرَجَ بِهِ (অতঃপর তার মাধ্যমে তিনি বের করেছেন) বলা হয়েছে। যার মধ্যে بِهِ (তার মাধ্যমে) বলতে পানিকে বুঝানো হয়েছে। আকাশ থেকে যে পানি বর্ষিত

[৪] *সূরা ইব্রা-হীম: ৩৪।*
[৫] *সূরা আন্-নাহ্ল: ১৮।*
[৬] *সূরা আল-ইনফিত্বার: ১-২।*
[৭] *সূরা আল-ওয়াক্বি'আহ্: ৬৯।*
[৮] *সূরা আন্-নাবা-: ১৪।*

হয়, তা মৃত জমিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। পানি ছাড়া মাটি অনুর্বর ও শক্ত থাকে তাই কোনো বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে না এবং কোন গাছ ফল দিতে পারে না। আল্লাহ আকাশ থেকে মিষ্টি পানি বর্ষণ করে মাটিকে নরম করেন এবং বীজের ভেতর লুকিয়ে থাকা সুপ্ত জীবনকে জাগ্রত করেন। উল্লেখ্য যে, ইসলামি 'আক্বীদাহ্ অনুযায়ী, পানি নিজের ক্ষমতায় ফলমূল উৎপাদন করতে পারে না; বরং আল্লাহ পানিকে ফলমূল উৎপাদনের একটি মাধ্যম বা উসিলা বানিয়েছেন। আর তিনি শুধু এই ফলমূল সৃষ্টিই করেননি; বরং মানুষের ক্ষুধা নিবারণ ও পুষ্টির জন্য এগুলোকে আমাদের খাদ্য বা 'রিযিক' হিসেবে দান করেছেন, ফলমূলের মধ্যে যে পরিমিত রস ও পুষ্টি উপাদান থাকে, তা মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সরাসরি ভূমিকা রাখে।

আল্লামা শানক্বিতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ এ আয়াতে পুনরুত্থান-এর ব্যাপারে দু'টি দলিলের দিকে ইঙ্গিত করেছেন যা অন্যান্য আয়াতেও সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

দলিল-১: আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এর দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন,

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰى أَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى﴾

"তারা কি এটুকুও বোঝে না, যে আল্লাহ জমিন ও আসমান সৃষ্টি করলেন এবং এগুলো সৃষ্টি করতে তিনি ক্লান্ত হননি, সে আল্লাহ মৃতকে অবশ্যই জীবিত করার ক্ষমতা রাখেন।"[৯]

এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা সূরা ইয়া-সীন: ৮১, সূরা বানী ইসরা-ঈল: ৯৯, সূরা আন্-না-যি'আত: ২৭ ও ২৮ নং আয়াতে এ ব্যাপারে বর্ণনা করেছেন।

দলিল-২: আল্লাহ তা'আলা জমিন নির্জীব হবার পর পুনরায় তা জীবিত করেন। এটা পুনরুত্থানের সবচেয়ে বড় দলিল। এর দিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ﴾

"এবং যিনি আকাশ হতে পনি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর তার দ্বারা তোমাদের জন্য উপজীবিকাস্বরূপ ফলমূল উৎপন্ন করেছেন।"[১০] অন্যান্য আরো কয়েকটি আয়াতে আল্লাহ এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ﴾

"আমি বৃষ্টি দ্বারা জীবিত করি মৃত ভূমিকে; এভাবেই পুনরুত্থান ঘটবে।"[১১] অনুরূপভাবে আল্লাহ সূরা হা-মীম, আস্-সিজদাহ্: ৩৯, সূরা আর্-রূম: ১৯ ও সূরা আল-আ'রাফ: ৫৭ নং আয়াতে এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন।

[৯] *সূরা আল-আহ্ক্বা-ফ: ৩৩।*
[১০] *সূরা আল-বাক্বারাহ্: ২২।*
[১১] *সূরা ক্বা-ফ: ১১।*

﴿فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ أَنْدَادًا وَّأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

'অতএব জেনে-বুঝে তোমরা তাঁর (আল্লাহর) সমকক্ষ স্থীর করো না।'

ব্যাখ্যা: এ আয়াতের প্রথমাংশে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদের ওপর তাঁর চারটি বিশেষ নিয়ামতের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা- **(১)** তিনি পৃথিবীকে বিছানাস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন। **(২)** তিনি আকাশকে ছাদস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন। **(৩)** তিনি আকাশ হতে পানি বর্ষণ করেন। **(৪)** অতঃপর ঐ পানি দিয়ে ফলমূল উৎপন্ন করেন, যা থেকে মানুষ ও জীবজন্তু উপকৃত হয়। এই নিয়ামতগুলো স্বরণ করিয়ে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তিনিই আমাদের ইবাদতের একমাত্র হক্বদার। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'অতএব জেনে-বুঝে তোমরা তাঁর (আল্লাহর) সমকক্ষ স্থীর করো না।' যেহেতু মানুষ নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করে খুব সহজেই বুঝতে পারে যে, পৃথিবী, আকাশ, বৃষ্টি এবং জীবিকার উৎস একমাত্র আল্লাহ। অতএব তাঁর ইবাদত, আনুগত্য এবং দাসত্ত্বেও কাউকে শরিক করা যাবে না। এ আয়াতে তারই দিকে আহ্বান করা হয়েছে এবং সংক্ষিপ্তরূপে তার প্রমাণও উপস্থিত করা হয়েছে। সে সময়ে আরবের মুশরিকরা স্বীকার করত, নিখিল বিশ্বের অস্তিত্ব দান করা, আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করা, আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করা এবং তা দ্বারা ফলমূল উৎপন্ন করা- এসব আল্লাহ তা'আলারই কাজ। তা সত্ত্বেও তারা মনে করত, আল্লাহ তা'আলা দেব-দেবীর ওপর অনেক কাজের দায়-দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন। তাই তারা এদের পূজা-অর্চনা করত। আয়াতে উল্লেখিত أَنْدَادًا শব্দটি نِدٌّ-এর বহুবচন। যার অর্থ সমকক্ষ স্থির করা। এখানে মহান আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এই সমকক্ষ স্থির করাটাই শির্ক। আর এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাপ।

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো– আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি? তিনি বললেন, 'আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।[১২]

অপর একটি বর্ণনায়- মু'আয ইবনু জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জিজ্ঞাসা করে বললেন: হে মু'আয! তুমি কি জানো বান্দার ওপর আল্লাহ তা'আলার হক্ব কী? মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: বান্দার ওপর আল্লাহ তা'আলার হক্ব হলো– বান্দা একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ইবাদত করবে অন্য কিছুকে তাঁর সাথে শরীক করবে না।[১৩]

শির্কের ভয়াবহতা: মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হলো একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দাসত্ব ও ইবাদত করা। আর শির্ক হলো সেই দাসত্ব ও ইবাদতে আল্লাহর তাওহীদের প্রকাশ্য

[১২] *সহীহ বুখারী- হা. ৪৪৭৭।*
[১৩] *সহীহ বুখারী- হা. ২৮৫৬।*

লঙ্ঘন। এটি কেবল একটি পাপই নয়; বরং সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সবচেয়ে বড় জুলুম ও সীমাহীন অন্যায়, অমার্জনীয় অপরাধ এবং মানবাত্মার চরমতম অবক্ষয়। নিম্নে তার ভয়াবহ কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো–

১. 'শির্ক' সবচেয়ে বড় জুলুম: জুলুমের মূল অর্থ হলো কোনো বস্তুকে তার সঠিক স্থান থেকে সরিয়ে অন্য স্থানে রাখা। মহাবিশ্বের একমাত্র ইবাদত ও আনুগত্য পাওয়ার হকদার আল্লাহ। সেই হক্ব অন্যকে দেওয়া সৃষ্টির সবচেয়ে বড় অন্যায় ও অকৃতজ্ঞতা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

"নিশ্চয়ই শির্ক হলো সবচেয়ে বড় জুলুম।"[১৪]

২. 'শির্ক' ক্ষমার অযোগ্য পাপ: শির্ক এমন একটি পাপ যা মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করে। কোনো ব্যক্তি শির্কের ওপর মৃত্যুবরণ করলে তার জন্য ক্ষমার সব পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। একনিষ্ঠ তাওবাহ্ ছাড়া শির্কের এ পাপ মাফ হয় না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরিক করার পাপ ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য সকল পাপ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন।"[১৫]

৩. 'শির্ক' সকল নেক 'আমল ধ্বংস করে দেয়: শির্ক হলো এমন একটি পাপ যা মানুষের সারাজীবনে অর্জিত যাবতীয় পুণ্যগুলোকে মুহূর্তেই বাতিল ও শূণ্য করে দেয়। কী ভয়ংকর কথা! আল্লাহ স্বয়ং তাঁর নবীকে বলছেন:

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"যদি তুমি শির্ক করো, তবে তোমার 'আমলসমূহ অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[১৬]

৪. শির্ককারীর জন্য জান্নাত হারাম, ঠিকানা তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নাম: শির্কের ওপর মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি কখনো কোনো অবস্থাতেই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য জান্নাতকে চিরতরে হারাম করে দিয়েছেন আর তাদের জন্য চিরস্থায়ী বাসস্থান নির্ধারণ করে রেখেছেন জাহান্নামে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ﴾

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শির্ক করে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন। আর তার বাসস্থান করে রেখেছেন জাহান্নামে।"[১৭]

৫. শির্ককারী সুপারিশের অযোগ্য: শির্ককারী এতবড় অপরাধী যে, হাশ্‌রের মাঠে তার জন্য সুপারিশ করার কেউ থাকবে না। তার জন্য কারো কোনো সুপারিশ করার অধিকার নেই। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন:

﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

"আর এই যালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী (সুপারিশকারী) নেই।"[১৮]

শির্কের প্রকারভেদ: ইসলামী 'আক্বীদাহ্ ও তাফসীরবিদদের পরিভাষায় 'আক্বীদাহ্ বিশ্লেষকগণ শির্ককে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। নিম্নে সংক্ষেপে তা উল্লেখ করা হলো–

১. তাওহীদের ক্ষেত্রভিত্তিক শির্ক: 'আক্বীদাহ্বিদগণ তাওহীদের তিনটি শাখার বিপরীতে শির্ককেও তিনটি ভাগে ভাগ করে থাকেন। যথা-

(১) শির্ক ফী রুবূবিয়্যাহ্ বা রুবূবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শির্ক: মহান স্রষ্টার যাবতীয় সৃষ্টি, রিয্ক, পরিচালনা ও তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতায় অন্য কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত করা এই প্রকারের শির্ক।

(২) শির্ক ফী উলূহিয়্যাহ্ বা ইবাদতের ক্ষেত্রে শির্ক: ইবাদতের কোনো অংশ আল্লাহ তা'আলা ছাড়া কিংবা মহান আল্লাহসহ অন্য কারো জন্য নির্ধারণ করা। যেমন- কোনো গাছ, পাথর, মাজার বা কোনো পীরের নামে মান্নত ও কুরবানি করা। এদেরকে সম্মানস্বরূপ সিজদাহ্ করা, তাদের কাছে কিছু চাওয়া ইত্যাদি এই প্রকারের শির্ক।

(৩) শির্ক ফী আসমা-ই ওয়াস-সিফাতিল্লাহি তা'আলা বা মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলির ক্ষেত্রে শির্ক: মহান আল্লাহর বিশেষ নাম ও গুণাবলিতে অন্য কাউকে শরীক করা বা মহান আল্লাহর জন্য নির্ধারিত বিশেষ গুণাবলী অন্য কোনো সৃষ্টিকে দেওয়া। যেমন- কোনো নবী, ওলী বা পীরকে আলেমুল গায়েব (অদৃশ্যের সব খবর জানেন) মনে করা। মহান আল্লাহকে সৃষ্টির যে কোনো কিছুর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করাও এই প্রকারের শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

২. অপরাধের তীব্রতার দিক থেকে শির্কের প্রকারভেদ: অপরাধের তীব্রতার দিক থেকে শির্ক দুই প্রকার। যথা-

(১) শির্কে আকবার (বড় শির্ক)– সংজ্ঞা: শির্কে আকবার হলো আল্লাহর ইবাদত বা সার্বভৌমত্বের কোনো অংশ স্পষ্ট ও সরাসরি অন্য কোনো সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা। **পরিণাম:** এটি এমন শির্ক যা মানুষকে ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ বের করে দেয়, যাবতীয় পূণ্যকর্মগুলো ধ্বংস করে দেয় এবং ঈমান নষ্ট করে ফেলে। এই অবস্থায় কেউ মারা গেলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। জান্নাত তার জন্য হারাম হয়ে যাবে এবং তার জন্য কোনো সাহায্যকারীও থাকবে না। **উদাহরণ: (ক)** প্রতিমা বা মূর্তির পূজা-অর্চনা করা। **(খ)** কোনো পীর, ওলী বা মাজারের নিকট সন্তান, আরোগ্য বা রিয্ক প্রার্থনা করা। **(গ)** আল্লাহ তা'আলা

[১৪] *সূরা লুক্বমা-ন: ১৩।*
[১৫] *সূরা আন্-নিসা: ৪৮ ও ১১৬।*
[১৬] *সূরা আয্-যুমার: ৬৫।*
[১৭] *সূরা আল-মায়িদাহ্: ৭২।*
[১৮] *সূরা আল-মায়িদাহ্: ৭২।*

ছাড়া অন্য কারো নামে পশু উৎসর্গ করা বা যবেহ করা। **(ঘ)** মহান আল্লাহর আইনের চেয়েও অন্য কোনো আইন বা অন্য কোনো বিধানকে উত্তম বা সমকক্ষ মনে করা।

(২) শির্কে আসগার (ছোট শির্ক)– সংজ্ঞা: শির্কে আসগার হলো এমন সব কথা বা কাজ যা সরাসরি বড় শির্ক নয়, কিন্তু তার মধ্যে শির্কের উপাদান বা মাধ্যম লুকিয়ে রয়েছে। **পরিণাম:** এটি বড় শির্কের মতো মানুষকে সরাসরি ইসলাম থেকে বের করে দেয় না এবং সে চিরস্থায়ী জাহান্নামীও হয় না। তবে এটি অন্যসকল কবিরাহ গুণাহের চেয়েও মারাত্মক এবং পরবর্তীতে শির্কে আকবার তথা বড় শির্কের দিকে ধাবিত হওয়ার পথ তৈরি করে। **উদাহরণ: (ক)** রিয়া বা লোকদেখানো যে কোনো ইবাদত। যেমন- মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য দান-সাদাক্বাহ্ করা বা কাউকে দেখানোর জন্য কোনো ইবাদত করা। **(খ)** আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা। যেমন- চন্দ্র-সূর্য, বাবা-মা এদের নামে শপথ করা বা কারো হাত-মাথা বা কোনো স্থানকে স্পর্শ করে শপথ করা। **(গ)** শুভ-অশুভ লক্ষণ নির্ণয় বা কুসংস্কারে বিশ্বাস করা। যেমন- কোনো পশু-পাখি বা দিনক্ষণকে অমঙ্গলের কারণ মনে করা। **(ঘ)** আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে যুক্ত করে কিছু বলা। যেমন- আল্লাহর ও আপনার দয়ায় কাজটি হলো। **(ঙ)** কোনো ওসীলাকে অতিমূল্যায়ন করা। যেমন- ডাক্তার না আসলে রোগীটি মারা যেত।

শির্কের সমকালীন কিছু রূপ: সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে শির্কের বাহ্যিক রূপ ও ধরনে পরিবর্তন এসেছে। বর্তমান যুগে মানুষ কেবল দৃশ্যমান কাঠ বা পাথরের মূর্তির পূজাই করে না; বরং আধুনিক চিন্তাধারা, দর্শন এবং প্রযুক্তির আড়ালে বহু আধুনিক শির্কে লিপ্ত হচ্ছে। নিম্নে এর প্রধান কয়েকটি রূপ আলোচনা করা হলো–

(১) ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও মানব-রচিত বিধানের অন্ধ অনুকরণ: জীবন ও সমাজের যেকোনো ক্ষেত্রে মহান আল্লাহর দেওয়া অকাট্য বিধান বা শরীয়তকে অচল, সেকেলে বা অসম্পূর্ণ মনে করা এবং মানুষের তৈরি আইনকে মহান আল্লাহর আইনের চেয়ে উত্তম বা সমকক্ষ মনে করা এক প্রকার আধুনিক শির্ক।

(২) প্রবৃত্তির দাসত্ব বা বস্তুবাদ: আধুনিক যুগে অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা, ক্যারিয়ার বা ভোগবিলাসকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বানিয়ে নেওয়া এবং এদের সন্তুষ্টির জন্য মহান আল্লাহর বিধানকে অবলীলায় লঙ্ঘন করা এক প্রকার প্রচ্ছন্ন শির্ক। পবিত্র কুরআনে একে 'প্রবৃত্তিকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা'[১৯] বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

(৩) জ্যোতিষশাস্ত্র, রাশিফল ও ভাগ্য গণনা: রাশিফল দেখে নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের চেষ্টা করা আধুনিক যুগের একটি বড় ব্যাধি। রাশি বা নক্ষত্রের অবস্থানের কারণে মানুষের লাভ-ক্ষতি, মঙ্গল বা অমঙ্গল হয় এমন বিশ্বাস করা 'আসমা ওয়াস-সিফাত' এবং 'রুবূবিয়্যাত'-এর পরিপন্থী শির্ক।

(৪) আধুনিক কুসংস্কার, তাবিজ ও সৌভাগ্য প্রতীক: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগেও অনেক মানুষ ভাগ্য বদল বা অমঙ্গল থেকে বাঁচতে বিভিন্ন আংটি, পাথর, কালো সুতা, কড়ির ব্যবহার কিংবা গাড়িতে বা ঘরের দরজায় 'নজর না লাগার' প্রতীক ঝুলিয়ে রাখে। কোনো জড় বস্তু বা পাথর মানুষের ক্ষতি রুখতে বা কল্যাণ আনতে পারে এমন বিশ্বাস করাও শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

(৫) অমুসলিমদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসবের অন্ধ অনুকরণ: সাংস্কৃতিক উদারতার নামে অমুসলিমদের এমন সব ধর্মীয় বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন উৎসবে যোগ দেওয়া বা সেগুলোকে উদযাপন করা, যার মূল ভিত্তিই হলো শির্ক। যেমন- মঙ্গল শোভাযাত্রায় বিভিন্ন কাল্পনিক মূর্তির মাধ্যমে কল্যাণ কামনা করা। কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক একমাত্র আল্লাহ -এই বিশ্বাসের সাথে এটি সরাসরি সাংঘর্ষিক।

(৬) বিজ্ঞান ও প্রকৃতির ওপর অন্ধ বিশ্বাস: বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতির কারণে অনেক সময় মানুষ স্রষ্টাকে ভুলে কেবল 'প্রকৃতি' (Nature) বা 'বিজ্ঞান'-কে সবকিছুর নিয়ন্ত্রক মনে করে বসে। যেমন- 'প্রকৃতির নিয়মেই সব চলছে' বা 'বিজ্ঞানই পারে মানুষকে অমরত্ব দিতে'- এমন চরমপন্থী বস্তুবাদী চিন্তাধারা মহান আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের ক্ষমতার সাথে সরাসরি সংঘাতপূর্ণ ও শির্ক।

শিক্ষাসমূহ

এই দারস থেকে আমরা নিম্নোক্ত শিক্ষাসমূহ গ্রহণ করতে পারি। যেমন-

১. মহান আল্লাহর একাত্মবাদ প্রতিষ্ঠা: সমস্ত সৃষ্টিজগতের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, মালিক ও মহাজাগতিক ব্যবস্থার নিয়ন্তা যেহেতু এক আল্লাহ তা'আলা সেহেতু ইবাদত পাওয়ার একমাত্র যোগ্য সত্তাও তিনিই।

২. মহান আল্লাহই একমাত্র রিযিকের উৎস: আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ এবং তা দিয়ে ফলমূল ও শস্য উৎপাদন করে মানুষের খাবারের ব্যবস্থা একমাত্র মহান আল্লাহই করেন।

৩. শির্ক এক অমার্জনীয় পাপ: শির্ক এত বড় পাপ যে, কোনো ব্যক্তি যদি শির্কের ওপর মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার পূণ্যসমূহও বাতিল হয়ে যাবে। তার জন্য জান্নাতে যাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। জাহান্নাম হবে তার চিরস্থায়ী ঠিকানা।

৪. যুক্তি ও বিবেকের ব্যবহার: মানুষ যখন নিজেই স্বীকার করে যে আকাশ, পৃথিবী ও রিযিকের মালিক আল্লাহ, তখন বিবেক খাঁটিয়ে কেবল তাঁরই আনুগত্য করাই তো উচিত।

৫. আধুনিক কুসংস্কার ও বস্তুবাদ থেকেও সতর্ক থাকা: অনেক সময় আধুনিক কুসংস্কার ও বস্তুবাদ মানুষকে মহান স্রষ্টার তাওহীদ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় কিংবা তাঁর সাথে শির্কে লিপ্ত করে। তাই আধুনিক কুসংস্কার ও বস্তুবাদ থেকে আমাদেরকে সদা সতর্ক থাকতে হবে।

[১৯] *সূরা আল-ফুরক্বা-ন: ৪৩।*

درس الحديث / দারসুল হাদীস:

শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড: তাক্বওয়া ও আল্লাহভীতি

গিয়াসুদ্দীন বিন আব্দুল মালেক*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِيِّ (ﷺ) مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ أَكْرَمُهُمْ أَتْقَاهُمْ.

সরল বাংলা অনুবাদ

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, লোকদের মধ্যে অধিক সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে অধিক আল্লাহ ভীরু, সে সবচেয়ে অধিক সম্মানিত।[২০]

হাদীসের ব্যাখ্যা

আলোচ্য হাদীসটি একটি হাদীসের অংশবিশেষ। এখানে রাসূল (ﷺ) তাক্বওয়াবান ব্যক্তিকে সম্মানিত বলেছেন। আমরা হাদীসটি ব্যাখ্যা করার আগে প্রথমে সংক্ষেপে তাক্বওয়া সম্পর্কে জেনে নেব। তাক্বওয়া শব্দটি وقي وقاء الله وقيا থেকে এসেছে। আনুগত্য ও দান-সাদাক্বার মাধ্যমে মহান আল্লাহর 'আযাব থেকে নিজকে রক্ষা করা অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন- বলা হয়: আল্লাহ তা'আলা অমুককে অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন। মহান আল্লাহর বাণী:

﴿وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ وَّاقٍ﴾

"এবং আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদের রক্ষা করার কেউ নেই।"[২১]

তবে আত্-তাক্বওয়া শব্দটি বিশেষ্য পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।[২২]

তাক্বওয়া শব্দের অপর একটি অর্থ হলো– ভয় করা, সাবধানতা অবলম্বন করা ও জবাবদিহিতা। যেমন- تقوى الله শব্দটি মহান আল্লাহর ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা, তাঁর যাবতীয় নির্দেশ পালন করা এবং সকল নিষেধাজ্ঞা থেকে দূরে থাকা ও বেঁচে থাকার মাধ্যমে তাঁকে ভয় করা বুঝায়।[২৩]

আল্লামা যামাখশারী বলেন, যে ঘোড়া কাদা মাটি ও ধুলোবালি থেকে নিজ ক্ষুর বাঁচিয়ে রাখে তাকে فرس وقى বলা হয়। কারণ কষ্টদায়ক সামান্য কিছুর স্পর্শ থেকেও সে তার ক্ষুরকে রক্ষা করে। আত্-তাক্বওয়া শব্দটি ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে রাখা অর্থে ব্যবহৃত হয়।[২৪]

'উমার ইবনু খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একবার উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাক্বওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আপনি কি কাঁটাযুক্ত পথে চলেছেন? 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হ্যাঁ। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পুনরায় বললেন, কিভাবে চলেছেন? জবাবে 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, পোশাকে যেন কাঁটা বিদ্ধ না হয়, গায়ে যেন কাঁটা না লাগে সে জন্য চেষ্টা করেছি ও সতর্কভাবে চলেছি। উবাই ইবনু কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এটাই হচ্ছে তাক্বওয়ার উদাহরণ।[২৫]

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, মহান আল্লাহর আনুগত্য করা ও তাঁর অবাধ্য না হওয়া, তাঁকে স্মরণ করা ও তাঁকে ভুলে না যাওয়া এবং তাঁর শোকর আদায় করা ও অকৃতজ্ঞ না হওয়াই তাক্বওয়া।[২৬]

---

* *প্রভাষক (আরবী), মহিমাগঞ্জ আলিয়া কামিল মাদ্‌রাসা, গাইবান্ধা।*

[২০] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৩৭৪।*

[২১] *সূরা আর-রা'দ: ৩৪।*

[২২] *লিসানুল আরব- ইবনু মানযুর, আল-কাহেরা দারুল মারিফা, শিরোনাম: وق।*

[২৩] *আল-মু'জামুল ওয়াসীত- ড. ইবরাহীম মাদকুর, দেওবন্দ কুতুবখানা হুসাইনিয়া, তা. বি., পৃ. ১০৫২।*

[২৪] *তাফসীর আল-কাশশাফ- আল্লামা যামাখশারী, মাকতাবা মিসর, তা. বি., খণ্ড: ১, পৃ. ৩৭।*

[২৫] *তারবিয়াতুল আওলাদ ফিল ইসলাম- আব্দুল্লাহ নাসের আলওয়ান, বৈরুতঃ দারুস সালাম, ১৯৮১ খৃ.।*

[২৬] *যাদুল মাসীর ফী ইলমিত তাফসীর- ইবনুল জাওযী, বৈরুত আল-মাকতাবাতুল ইসলামী, ১৪০৪ হি., খণ্ড: ১, পৃ. ৪৩১।*

'উমার ইবনু 'আব্দুল 'আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা যা হারাম করেছেন তা বর্জন করা এবং তিনি যা ফরয করেছেন তা পালন করাই হচ্ছে তাক্বওয়া।[২৭]

আল্লাহভীতি দুনিয়া ও আখেরাতে সম্মানিত হওয়ার মাধ্যম। যে ব্যক্তি যতবেশী আল্লাহভীরু তিনি মহান আল্লাহর নিকটে ততবেশি সম্মানিত। মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি হলেন মুত্তাকিগণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَكُمْ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে সম্মানিত সেই ব্যক্তি যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তাক্বওয়াবান।"[২৮]

আল্লাহ তা'আলার নিকট তাক্বওয়ার মূল্য অত্যাধিক। ধন-সম্পদ, শক্তি-ক্ষমতা, গাড়ি-বাড়ি থাকলেই মানুষ আল্লাহ তা'আলার নিকট মর্যাদা লাভ করতে পারে না; বরং যে ব্যক্তি তাক্বওয়া অবলম্বন করতে পারেন সেই আল্লাহ তা'আলার নিকট বেশি মর্যাদাবান। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ভালোবাসেন। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং বলেছেন-

﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন।"[২৯]

পার্থিব জীবনে মুত্তাকিগণ আল্লাহ তা'আলার বহু নিয়ামত লাভ করে থাকেন। আল্লাহ তা'আলা তাক্বওয়াবানদের সর্বদা সাহায্য করেন। বিপদাপদ থেকে উদ্ধার করেন ও বরকতময় রিয্ক দান করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَ مَنْ يَّتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝ وَّ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

"যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ করে দেবেন এবং তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিয্ক দান করবেন।"[৩০]

পরকালেও তাক্বওয়াবানদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার। আল্লাহ তা'আলা শেষ বিচারের দিন মুত্তাকিদের সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন এবং মহাসফলতা দান করবেন। আল-কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّ يُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَ اللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ﴾

"হে মু'মিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তবে আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দিবেন, তোমাদের পাপ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং আল্লাহ অতিশয় মঙ্গলময়।"[৩১]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا﴾

"নিশ্চয়ই মুত্তাকিগণের জন্য রয়েছে সফলতা।"[৩২]

প্রকৃতপক্ষে তাক্বওয়া মানব চরিত্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্বভাব। এর মাধ্যমে মানুষ সম্মান, মর্যাদা ও সফলতা লাভ করে। তাক্বওয়া মু'মিনের একমাত্র সম্বল। যা মানুষকে সম্মানিত করে। তাক্বওয়াশীলদেরকেই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ﷺ) সবচেয়ে সম্মানিত বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ﴾

"হে মানবসমাজ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর তোমাদেরকে বিভিন্ন কাওম ও গোত্র বানিয়ে দিয়েছি, যাতে তোমরা একে অপরকে (ঐসব নামে) চিনতে পার। আসলে আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে তারাই অধিক সম্মানিত,যারা তোমাদের মধ্যে বেশি মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।"[৩৩]

এখানে আল্লাহ তা'আলা পরহেযগার মানুষকেই সবচেয়ে বড় সম্মানিত মানুষ বলে উল্লেখ করেছেন।

---

[২৭] *আত্-তাক্বওয়া- তা. বি., পৃ. ৩।*
[২৮] *সূরা আল-হুজুরা-ত: ১৩।*
[২৯] *সূরা আত্ তাওবাহ্: ৪।*
[৩০] *সূরা আত্-ত্বালা-ক্ব: ২-৩।*
[৩১] *সূরা আল-আনফাল: ২৯।*
[৩২] *সূরা আন্-নাবা-: ৩১।*
[৩৩] *সূরা আল-হুজুরা-ত: ১৩।*

অত্র আয়াতে একথাও বলা হয়েছে যে, বংশ মর্যাদা সম্মানিত হওয়ার মাধ্যম নয় এবং নারী বা পুরুষ হয়ে জন্ম নেয়াও সম্মানিত হওয়ার মাধ্যম নয়। মানুষ কেবল তাক্বওয়ার ভিত্তিতে ইহাকাল ও পরকালে সম্মান লাভ করতে পারে।

আল্লামা ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, মহান আল্লাহর বাণী: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾-এর মর্ম হলো– মহান আল্লাহর নিকট একের উপর অপরের মর্যাদার তারতম্য হবে তাক্বওয়ার কারণে, বংশমর্যাদার কারণে নয়।

বিদায় হজ্জের ভাষণেও এই মর্মে বর্ণিত হয়েছে, জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আইয়ামে তাশরীক্বের মধ্যবর্তী দিনে আমাদের উদ্দেশ্যে বিদায়ী ভাষণ দিয়ে বলেন,

يا أيُّها الناسُ إنَّ ربَّكمْ واحِدٌ ألا لا فضلَ لِعربِيٍّ على عجَمِيٍّ ولا لِعجَمِيٍّ على عربِيٍّ ولا لأحمرَ على أسْودَ ولا لأسودَ على أحمرَ إلَّا بالتَّقوَى إنَّ أكرَمكمْ عند اللهِ أتقاكُمْ.

হে জনগণ! নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা মাত্র একজন। তোমাদের পিতাও মাত্র একজন। মনে রেখ! আরবের উপর অনারবের, অনারবের উপর আরবের, লালের উপর কালোর এবং কালোর উপর লালের কোনোরূপ প্রাধান্য নেই তাক্বওয়া ব্যতীত। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে মহান আল্লাহর নিকটে সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক তাক্বওয়াশীল।[৩৪]

রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

যার কর্ম তাকে পিছে সরিয়েছে, তার বংশ মর্যাদা তাকে আগে বাড়াতে পারবে না।[৩৫]

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন,

﴿فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾

"তোমরা আল্লাহকে যথা সম্ভব ভয় করো।"[৩৬]

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার সাধ্য অনুযায়ী পরহেযগারিতা অবলম্বন করার জন্য আদেশ করেছেন। অন্যত্র তিনি আরো বলেন,

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো।"[৩৭]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পরহেযগারিতা অবলম্বন করতে বলেন এবং সত্য কথা বলতে আদেশ করেন। অপর এক আয়াতে পরহেযগারিতা অবলম্বনের উপকারিতা তুলে ধরে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تَتَّقُوْا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চলো, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার মানদণ্ড দান করবেন। তোমাদের পাপ মিটিয়ে দিবেন। আর তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। কারণ আল্লাহ বড় অনুগ্রহশীল।"[৩৮]

অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা চারটি জিনিসের কথা বলেছেন- (১) পরহেযগার হতে বলেছেন, (২) বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা মানদণ্ড দিবেন, (৩) পাপ মিটিয়ে দিবেন, (৪) ক্ষমা করে দিবেন। আর আল্লাহভীতি বা তাক্বওয়া মানুষকে ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করে চলার মানসিকতা তৈরি করে দেয়। এক কথায়, তাক্বওয়া মানুষের জীবিকার গ্যারান্টি হতে পারে।

নবী কারীম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যুদ্ধের প্রধান সেনাপতিকে তাক্বওয়াশীল হওয়ার জন্য আদেশ করতেন,

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) إِذَا أَمَّرَ أَمِيْرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِيْ خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا.

[৩৪] বায়হাক্বী- শু'আবুল ঈমান, হা. ৫১৩৭।
[৩৫] সহীহ মুসলিম; মিশকাত- হা. ২০৪।
[৩৬] সূরা আত্-তাগা-বুন: ১৬।
[৩৭] সূরা আল-আহ্যা-ব: ৭০।
[৩৮] সূরা আল-আনফাল: ২৯।

সুলায়মান ইবনু বুরাইদাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন তার পিতা বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন কোনো সৈন্যদলের আমীর নির্ধারণ করতেন, তখন তাকে বিশেষভাবে মহান আল্লাহকে ভয় করার তথা তাক্বওয়া অবলম্বন করার জন্য আদেশ করতেন। আর সাধারণ মুসলিম যোদ্ধাদেরকে কল্যাণের উপদেশ দিতেন।[৩৯]

সমাজজীবনে তাক্বওয়ার প্রয়োজনীয়তাঃ একটি সমাজকে সুন্দর, সুষ্ঠু, পবিত্র, পরিশুদ্ধ সর্বোপরি সমৃদ্ধশালী করতে হলে ইসলামি আখলাকের প্রধান গুণ 'তাক্বওয়া' বা আল্লাহভীতি অবলম্বন করা আবশ্যক। এর মাধ্যমেই একটি আদর্শ সমাজ গঠন হতে পারে। কারণ তাক্বওয়াবান ব্যক্তি মানেই আদর্শবান। আর এ ধরনের ব্যক্তির সমন্বয়ে যে সমাজ গঠিত হয় সে সমাজই আদর্শ সমাজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই আদর্শ সমাজের জন্য তাক্বওয়া প্রধান উপকরণ। সুতরাং আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ করতে চাইলে সমাজের সব সদস্যকে তাক্বওয়ার জীবন অবলম্বন করা অপরিহার্য।

সমাজে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য তাক্বওয়া অর্জন করা অপরিহার্য। যার মধ্যে এই গুণ থাকে সে হয় আস্থা ও বিশ্বাসের পাত্র। ছোট-বড় সবাই তার প্রতি আস্থা রাখে। যার ফলে সে মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস বিরোধী কোনো কাজ করে না। আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা ও সততা ছাড়া সামাজিক উন্নয়ন তথা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আসতে পারে না। আর এসব গুণের উৎস হচ্ছে তাক্বওয়া। এ ক্ষেত্রেও তাক্বওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম।

সমাজে সর্বোত্তম ব্যক্তিরা সমাদৃত হয় এবং মর্যাদা পায়। আর সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব অর্জনের জন্য তাক্বওয়ার গুণ অর্জন করা আবশ্যক। তাদের সম্মানজনক অবস্থান ও মর্যাদা তাক্বওয়ার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। মূলত তাক্বওয়ার মাধ্যমেই সম্মান, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদায় একে অপরকে ছাড়িয়ে যায়। এটা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সামাজিক নিরাপত্তা, পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা সৃষ্টির জন্য তাক্বওয়া অবলম্বন করা জরুরি। তাক্বওয়াবিহীন সমাজে সামাজিক আস্থা ও নিরাপত্তা গড়ে উঠে না। যার ভেতরে তাক্বওয়া নেই তার দ্বারা যে কোনো অঘটন বা অনিষ্ট সম্ভব। তাই এ রকম লোকের প্রতি মানুষের আস্থা থাকে না। সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তা ও আস্থার জন্য তাক্বওয়া অত্যাবশ্যক।

সামাজিক সাম্য, সম্প্রীতি ও সংহতি সৃষ্টিতে তাক্বওয়ার বিকল্প নেই। তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি মানুষের মনে অপর মানুষের প্রতি ভালোবাসা, মর্যাদা ও শ্রদ্ধা সৃষ্টি করে। মানুষে মানুষে সাম্য, সম্প্রীতি ও সংহতি গড়ে তোলে। তাক্বওয়াভিত্তিক ভালোবাসা হচ্ছে অকৃত্রিম ও স্থায়ী ভালোবাসা, যাতে কোনো ফাঁকিবাজি ও প্রতারণা নেই। যাবতীয় ভেদ-বৈষম্য ও পার্থক্য দূরীভূত করে মহান আল্লাহর বান্দা হিসেবে সবাই মিলেমিশে জীবনযাপন করে।

উপসংহার

নৈতিক জীবন গঠনে ও নীতি-নৈতিকতা রক্ষায় তাক্বওয়ার প্রভাব অনস্বীকার্য। তাক্বওয়া সকল সৎগুণের মূল। ইসলামি নৈতিকতার মূল ভিত্তি হলো তাক্বওয়া। তাক্বওয়া মানুষকে মানবিক ও নৈতিক গুণাবলিতে উদ্বুদ্ধ করে। হারাম বর্জন করতে এবং হালাল গ্রহণ করতে প্রেরণা যোগায়। মুত্তাকি ব্যক্তি সদাসর্বদা আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করেন। আল্লাহ তা'আলা সবকিছু দেখেন, শোনেন, জানেন, এ বিশ্বাস পোষণ করেন। ফলে তিনি কোনোরূপ অন্যায় ও অনৈতিক কাজ করতে পারেন না। কোনোরূপ অশ্লীল ও অশালীন কথা, কাজ ও চিন্তাভাবনা করতে পারেন না। কেননা তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, পাপ যত গোপনেই করা হোক না কেন, আল্লাহ তা'আলা তা দেখেন ও জানেন। কোনোভাবেই আল্লাহ তা'আলাকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব নয়। ফলে তাক্বওয়াবান ব্যক্তি সকল কাজেই নীতি-নৈতিকতা অবলম্বন করেন এবং অনৈতিকতা ও অশ্লীলতা পরিহার করেন। আর এভাবেই একজন মানুষ তাক্বওয়ার কারণে সম্মানিত হতে থাকেন।

[৩৯] *সহীহ মুসলিম; বুলূগুল মারাম- হা. ১২৬৮।*

مقالةرئيسة / প্রধান রচনা

ইখতিলাফের আদব ও দলাদলি থেকে মুক্তির উপায়: তাত্ত্বিক ও প্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণ

মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম

ভূমিকা: ইখতিলাফ বা মতভেদ মানব জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য ও স্বাভাবিক বাস্তবতা। মানুষের চিন্তা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, ভাষাগত অনুধাবন ও প্রেক্ষাপটগত পার্থক্যের কারণে মতের ভিন্নতা অনিবার্যভাবে জন্ম নেয়। ইসলামী ঐতিহ্য ও উসূলুল-ফিকহ এ বাস্তবতাকে সম্পূর্ণ নেতিবাচক হিসেবে দেখেনি; বরং এটিকে জ্ঞানের বিকাশ, বৌদ্ধিক পরিপক্কতা এবং শরিয়তের গতিশীল প্রয়োগের একটি স্বাভাবিক উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। নিয়ন্ত্রিত ও নীতিনিষ্ঠ ইখতিলাফ উম্মাহর ভেতরে চিন্তার বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে, সমস্যার বহুমাত্রিক সমাধানের পথ উন্মুক্ত করে এবং সহনশীলতার সংস্কৃতি গড়ে তোলে। কিন্তু যখন এই মতভেদ আদব, প্রমাণনির্ভরতা ও নৈতিক সংযম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখন তা বিভাজন, দলাদলি ও পারস্পরিক অবিশ্বাসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সমসাময়িক মুসলিম সমাজে যে সংকট ও বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, তার একটি মৌলিক কারণ হলো আদাবুল-ইখতিলাফের অবক্ষয় এবং জ্ঞানভিত্তিক মতপার্থক্যকে সঠিকভাবে পরিচালনায় ব্যর্থতা।

ইখতিলাফের ঐতিহাসিক ও ধর্মতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

ইসলামের সূচনালগ্ন থেকেই ইখতিলাফ বা মতভেদ একটি প্রকৃতিগত বিষয় হিসেবে বিদ্যমান। সাহাবায়ে কিরাম (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করলেও তাদের মাঝে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, আন্তরিকতা ও ঈমানি ভ্রাতৃত্ব অটুট ছিল। তারা মতের ভিন্নতাকে ব্যক্তিগত শত্রুতায় পরিণত করেননি; বরং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সর্বোত্তম মত অনুসন্ধানকেই লক্ষ্য করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾

"তোমরা যদি কোনো বিষয়ে মতভেদ করো, তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন করো।"[১]

এই আয়াত নির্দেশ করে যে ইখতিলাফের সমাধান ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়; বরং ওহিভিত্তিক হওয়া উচিত। সুতরাং মতভেদ নিজেই সমস্যা নয়; সমস্যাটি হলো তার অনিয়ন্ত্রিত ও অনৈতিক ব্যবস্থাপনা। ইতিহাস প্রমাণ করে যে ইসলামের বিভিন্ন যুগে রাজনৈতিক ও সামাজিক চাপের পরেও ইখতিলাফকে নিয়ন্ত্রণ করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ছিল। সাহাবা ও তাবিইনদের মধ্যে নৈতিক দৃষ্টিকোণ এবং জ্ঞানভিত্তিক পার্থক্য ব্যবস্থাপনার একটি সুস্পষ্ট কাঠামো ছিল, যা সমসাময়িক মুসলিম সমাজের জন্য শিক্ষা হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

ইখতিলাফের ধারণা ও প্রকারভেদ: তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইখতিলাফ মানে– কথা, মত বা অবস্থানে ভিন্নতা পোষণ করা। পরিভাষায় বলা হয়–

الخلافُ والاختِلافُ والمُخالَفةُ: أن يأخُذَ كُلُّ واحِدٍ طريقًا غَيرَ طريقِ الأوَّلِ في فِعلِه أو حالِه.

"খিলাফ, ইখতিলাফ ও মুখালাফাহ, এর অর্থ হলো– প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজ বা অবস্থায় অন্যজনের পথ ছাড়া ভিন্ন একটি পথ গ্রহণ করা।"[২]

মানুষের বক্তব্যে মতভেদ কখনো কখনো বিবাদে রূপ নিতে পারে– এ কারণে ইখতিলাফ শব্দটি বিবাদ ও তর্ক-বিতর্কের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। ইখতিলাফ মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি এবং তা কখনো কখনো সংঘাতের রূপ নিতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ﴾

"দলগুলো নিজেদের মধ্যে মতভেদে লিপ্ত হলো।"[৩]

তিনি আরো বলেন–

﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾

"তারা সদা মতভেদে লিপ্ত থাকবে।"[৪]

অতএব, ইখতিলাফ বা মতভেদ মূলত ভিন্নতা প্রকাশ, কিন্তু এর রূপ ও ফল নির্ভর করে উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির ওপর। মৌলিকভাবে ইখতিলাফ দুই প্রকারে বিভক্ত।

---

[১] *সূরা আন-নিসা: ৫৯।*
[২] *আল-মুফরাদাত লিল ইমাম আসবাহানী- ১/৩২ পৃ.।*
[৩] *সূরা মারইয়াম: ৩৭, আয-যুখরুফ: ৬৫।*
[৪] *সূরা হূদ: ১১৮।*

১. নিন্দনীয় ইখতিলাফ– বিভাজনের মূল উৎস: নিন্দনীয় ইখতিলাফ সাধারণত সত্য অনুসন্ধানের পরিবর্তে ব্যক্তিগত অহংকার, ক্ষমতালিপ্সা, দলীয় আনুগত্য বা অজ্ঞতা থেকে জন্মায়। এতে লক্ষ্য থাকে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা বা নিজের মতকে একমাত্র সঠিক প্রমাণ করা। এ ব্যাপারে আল কুরআনে সতর্ক করে বলা হয়েছে–

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ﴾

"তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পর বিভক্ত হয়েছে।"[১]

নিন্দনীয় ইখতিলাফে বিজয় লাভই মুখ্য হয়ে ওঠে। নৈতিকতা, পারস্পরিক সম্মান এবং জ্ঞানচর্চার উন্নয়ন সেখানে উপেক্ষিত থাকে। ফলে এটি ঐক্যকে দুর্বল করে এবং বিভাজনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়।

২. প্রশংসনীয় ইখতিলাফ– জ্ঞানসমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য: প্রশংসনীয় ইখতিলাফ মূলত ইজতিহাদভিত্তিক পার্থক্য। ভাষাগত ব্যাখ্যা, হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা বা উসূলগত পদ্ধতির ভিন্নতার কারণে মতভেদ সৃষ্টি হয়, যা জ্ঞানচর্চার স্বাভাবিক ফল। ইমাম আবূ হানিফা, মালিক ইবনু আনাস, মুহাম্মদ ইবনু ইদরিস শাফিঈ এবং আহমদ ইবনু হাম্বল –এদের মতভেদ ইসলামী আইনশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। তারা একে অপরকে কাফির বা বিদআতী আখ্যা দেননি; বরং ইজতিহাদের বৈধতা স্বীকার করেছেন।

প্রশংসনীয় ইখতিলাফ উম্মাহর জন্য 'রাহমাহ' বা প্রশস্ততার উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে; এটি সহনশীলতা, বৌদ্ধিক বিকাশ এবং বহুমাত্রিক জ্ঞানচর্চাকে উৎসাহিত করে। এ প্রসঙ্গে ইবনু কুদামা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ আল মুগনী-তে উল্লেখ করেন–

وَجَعَلَ فِيْ سَلَفِ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَئِمَّةً مِنَ الْأَعْلَامِ، مَهَّدَ بِهِمْ قَوَاعِدَ الْإِسْلَامِ، وَأَوْضَحَ بِهِمْ مُشْكِلَاتِ الْأَحْكَامِ، اِتَّفَاقُهُمْ حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ، وَاخْتِلَافُهُمْ رَحْمَةٌ وَاسِعَةٌ.

"এই উম্মতের পূর্বসূরিদের মধ্যে এমন বিশিষ্ট ইমামগণ ছিলেন, যাঁদের মাধ্যমে ইসলামের ভিত্তিমূল সুদৃঢ় হয়েছে এবং শরিয়তের জটিল বিধানসমূহ সুস্পষ্ট হয়েছে। তাঁদের ঐকমত্য চূড়ান্ত প্রমাণরূপে গ্রহণযোগ্য, আর তাঁদের মতভেদ বিস্তৃত রহমত হিসেবে বিবেচিত।"[২]

এ বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নিয়ন্ত্রিত ও নীতিনিষ্ঠ ইখতিলাফ শরিয়তচর্চাকে দুর্বল করে না; বরং তা জ্ঞানের পরিসর প্রসারিত করে এবং বাস্তবতার বহুমাত্রিক প্রয়োগে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ইখতিলাফের জ্ঞানতাত্ত্বিক ও নৈতিক ভিত্তি

১. সত্যসন্ধানী নিয়ত– বিতর্ক নয়, অনুসন্ধান: ইখতিলাফে অংশগ্রহণের অর্থ কেবল নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করা নয়; বরং এর লক্ষ্য হওয়া উচিত সত্যকে অন্বেষণ করা। আবূ হামিদ আল গাযালী তাঁর إحياء علوم الدين গ্রন্থে সত্য অনুসন্ধানে আন্তরিকতার অপরিহার্যতার কথা উল্লেখ করেন। তার মতে, কোনো ব্যক্তি যদি কেবল জয়লাভ বা প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করার মানসিকতা নিয়ে বিতর্কে অবতীর্ণ হন, তবে তিনি ইখতিলাফের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ করেন।

সত্য যদি অন্যের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তবুও তা আনন্দের বিষয় –এই মানসিকতা ইখতিলাফকে প্রতিযোগিতা থেকে সহযোগিতায় রূপান্তরিত করে। অতএব, ইখতিলাফ একটি জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া; সত্যের প্রতি অঙ্গীকারই ব্যক্তিগত ও সামাজিক উৎকর্ষের পথ উন্মুক্ত করে।

২. প্রমাণনির্ভরতা ও জ্ঞানসম্পন্নতা: ইখতিলাফে অংশগ্রহণের জন্য ন্যূনতম জ্ঞান, প্রমাণ বিশ্লেষণের সক্ষমতা এবং যুক্তিবোধ থাকা অপরিহার্য। ইবনু তাইমিয়্যা তাঁর درء تعارض العقل والنقل গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, দুর্বল জ্ঞান বা অস্পষ্ট ধারণা নিয়ে বিতর্কে প্রবেশ করা ব্যক্তি কেবল নিজেকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না; বরং অন্যদেরও বিভ্রান্তির দিকে ঠেলে দেয়।

অতএব, ইখতিলাফে অবতীর্ণ হওয়ার আগে প্রমাণসমূহ যাচাই করা, উসূলগত কাঠামো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখা এবং যুক্তিকে শৃঙ্খলিতভাবে বিশ্লেষণ করার সক্ষমতা অর্জন করা জরুরি। এতে মতভেদ নিয়ন্ত্রিত, গঠনমূলক ও ফলপ্রসূ হয়।

৩. ন্যায়পরায়ণতা, ইনসাফ ও ভ্রাতৃত্ববোধ: ইখতিলাফের সময় নৈতিক মান বজায় রাখা সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কুরআনে উল্লেখ আছে–

[১] *সূরা আ-লি-'ইমরান: ১০৫।*

[২] *আল-মুগনী- মা. শা., ১/৪।*

﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا﴾

"কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ যেন তোমাদের ন্যায়বিচার থেকে বিরত না রাখে।"[১]

এটি প্রমাণ করে যে, মতভেদ ও বিতর্কের ক্ষেত্রেও প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে সম্মান করা, কু-ধারণা পরিহার করা এবং ইনসাফপূর্ণ আচরণ বজায় রাখা অপরিহার্য।

'উমার ইবনু আব্দুল 'আযীয সাহাবীদের মতভেদকে উম্মাহর জন্য রহমত হিসেবে দেখতেন। এর তাৎপর্য হলো– ভিন্নমতকে বিদ্বেষের কারণ না বানিয়ে শিক্ষার ও উপলব্ধির সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করা। এমন দৃষ্টিভঙ্গি ইখতিলাফকে বিভাজনের উৎস নয়; বরং সমাজ ও ধর্মীয় জীবনের একটি সৃষ্টিশীল ও পরিশীলত উপকরণে পরিণত করে।

দলাদলির কারণসমূহ– সমাজতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

১. অজ্ঞতা ও আংশিক জ্ঞান: পূর্ণ অজ্ঞতা যেমন ক্ষতিকর, আংশিক জ্ঞান অনেক সময় তার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। যখন কেউ কিছু তথ্য জানে কিন্তু তা পূর্ণাঙ্গভাবে অনুধাবন করে না, তখন সে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং অন্যদেরও বিভ্রান্ত করতে পারে। এ কারণেই কুরআনে সতর্ক করে বলা হয়েছে–

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾

"যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার পেছনে লেগো না।"[২]

সমসাময়িক বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মানুষের হাতে বিপুল তথ্য তুলে দিয়েছে; কিন্তু যাচাই-বাছাই ছাড়া তথ্য গ্রহণের প্রবণতা বিভ্রান্তি বাড়িয়েছে। সীমিত বা অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে অবস্থান গ্রহণ করলে মতভেদ দ্রুত বিভাজনে রূপ নেয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো হাদীস বা ধর্মীয় পাঠ আংশিকভাবে বুঝে তা প্রচার করলে সমাজে অপ্রয়োজনীয় উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে।

২. ব্যক্তিপূজা ও অন্ধ অনুসরণ: কোনো আলেম, নেতা বা দলের প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্য সমালোচনামূলক চিন্তাকে স্তব্ধ করে দেয়। এতে ভিন্নমতকে অবজ্ঞা করা হয় এবং সহিষ্ণুতা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মনস্তাত্ত্বিকভাবে এটি 'গ্রুপ থিংক' বা অন্ধ আনুগত্যের সংস্কৃতি সৃষ্টি করে, যেখানে দলীয় অবস্থানই চূড়ান্ত সত্য হিসেবে বিবেচিত হয়। রাসূল (ﷺ) সতর্ক করে বলেন–

«لَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ».

"তোমরা মতভেদ করো না, তাহলে তোমাদের অন্তর বিভক্ত হয়ে যাবে।"[৩]

তিনি অন্যত্র বলেন–

«إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بِاخْتِلَافِهِمْ فِيْ الْكِتَابِ».

"তোমাদের পূর্ববর্তীরা কিতাব নিয়ে মতভেদ করেছিল, ফলে ধ্বংস হয়েছে।"[৪]

বস্তুত অন্ধ আনুগত্য ইখতিলাফকে জ্ঞানভিত্তিক আলোচনার পর্যায় থেকে সরিয়ে আবেগপ্রবণ সংঘাতে রূপান্তরিত করে।

৩. রাজনৈতিক ও গোষ্ঠীগত স্বার্থ: অনেক ক্ষেত্রে ধর্মীয় মতভেদের অন্তরালে রাজনৈতিক বা সামাজিক স্বার্থ সক্রিয় থাকে। ব্যক্তিগত প্রভাব, গোষ্ঠীগত আধিপত্য কিংবা ক্ষমতার লড়াই মতপার্থক্যকে তীব্র করে তোলে। তখন বিতর্ক আর কেবল তাত্ত্বিক থাকে না; বরং তা সামাজিক প্রতিযোগিতা ও শক্তির দ্বন্দ্বে রূপ নেয়। ধর্মীয় মত ও রাজনৈতিক স্বার্থের সংমিশ্রণ সমাজে বিভাজনকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারে।

৪. পরিভাষাগত বিভ্রান্তি: ধর্মীয় ও তাত্ত্বিক আলোচনায় ব্যবহৃত বিশেষ পরিভাষা অনেক সময় অপ্রয়োজনীয় বিরোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একই শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। যেমন- তাহ্ক্বীক্ব: কোনো বিষয় যাচাই করা বা গভীরভাবে অনুসন্ধান। তাকলীদ: পূর্ববর্তী পণ্ডিতের মত অনুসরণ। বিদআত: নবীনত্ব বা প্রথার নতুনত্ব, যা কখনো নেতিবাচক অর্থে নেওয়া হয়। যদি এসব শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন না করা হয়, তবে ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে অযাচিত মতবিরোধ সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং, পরিভাষার সঠিক সংজ্ঞা ও প্রেক্ষাপট বোঝা দলাদলি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দলাদলি প্রতিরোধে করণীয়: নৈতিক ও প্রমাণনির্ভর পদ্ধতি

১. কুরআন-সুন্নাহ ও উসূলভিত্তিক প্রত্যাবর্তন: মতভেদ বা বিতর্কের সময় আবেগ, ব্যক্তিগত পক্ষপাত ও দলীয় সংকীর্ণতা পরিহার করে প্রামাণ্য উৎসের দিকে প্রত্যাবর্তন অপরিহার্য।

[১] *সূরা আল-মায়িদাহ: ৮।*
[২] *সূরা বানী ইসরা-ঈল/ইস্‌রা: ৩৬।*
[৩] *সুনান ইবনু মাজাহ- হা. ৯৭৬, সহীহ।*
[৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ২/২৬৬৬।*

ক. কুরআন ও সুন্নাহ- এটি ইসলামী জ্ঞানব্যবস্থার সর্বোচ্চ প্রামাণ্য উৎস। কাজেই যে কোনো মতবিরোধের ক্ষেত্রে কুরআন-সুন্নাহকে মূল ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। মতামত নয়, দলিলই হবে চূড়ান্ত মানদণ্ড।

খ. উসূল বা মূলনীতি- কেবল আংশিক উদ্ধৃতি বা আবেগপ্রসূত ব্যাখ্যা নয়; বরং সুসংহত উসূলগত কাঠামোর আলোকে প্রমাণ বিশ্লেষণ করা জরুরি। এতে নিশ্চিত হয় যে মতভেদ ব্যক্তিগত অভিমান বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে নয়; বরং সঠিক অনুসন্ধান ও যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাধানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

২. অগ্রাধিকার নির্ধারণ– মৌলিক ও গৌণ বিষয়ের পার্থক্য: উম্মাহর জীবনে সব মতভেদ সমান গুরুত্ব বহন করে না। তাই সমস্যার অগ্রাধিকার নির্ধারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ক. মৌলিক সমস্যা: 'আক্বীদার দুর্বলতা, ইবাদতের অবহেলা, নৈতিক অবক্ষয় –এসব মৌলিক সংকট সমাধান না হলে স্থায়ী কল্যাণ বা ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় না।

খ. গৌণ ফিকহী পার্থক্য: নির্দিষ্ট ফিকহি বিধান বা পদ্ধতির পার্থক্য –যা ইজতিহাদভিত্তিক –এসব বিষয়ে অতিরিক্ত শক্তিক্ষয় অযৌক্তিক। মূল প্রশ্ন হলো– কোন বিষয়টি উম্মাহর অস্তিত্ব ও শক্তির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত? শক্তি ও মনোযোগ মৌলিক বিষয়ে কেন্দ্রীভূত হলে উম্মাহ সুসংহত হয় এবং অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক হ্রাস পায়।

৩. ঐকমত্যে সহযোগিতা– ঐক্য ও কল্যাণমূলক কর্মধারা: যেসব বিষয়ে মুসলিম সমাজে ঐকমত্য বা সাধারণ সম্মতি রয়েছে, সেখানে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ ঐক্যকে সুদৃঢ় করে।

ক. উদাহরণ: সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যক্রম, দরিদ্রদের সহায়তা, শিক্ষা বিস্তার ও স্বাস্থ্যসেবা।

খ. সম্মিলিত কর্মধারা: ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করলে মানুষের মাঝে সহমর্মিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে ওঠে।

গ. যৌথ উদ্যোগ: এতে দলাদলি ও বিভাজন হ্রাস পায়, কারণ সকলে দেখেন যে মূল উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত মতের জয় নয়; বরং সামষ্টিক কল্যাণ।

এভাবে ইতিবাচক কর্মমুখী ঐক্য দলাদলির প্রবণতা কমিয়ে আনে।

৪. অন্তরের সংস্কার– অহংকার ও বিদ্বেষ থেকে মুক্তি: কেবল কাঠামোগত বা প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ যথেষ্ট নয়; অন্তরের পরিশুদ্ধিও অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন–

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

"আল্লাহ তোমাদের চেহারা বা সম্পদের দিকে তাকান না; বরং তোমাদের অন্তর ও 'আমলের দিকে তাকান।"[১]

এ থেকে প্রতীয়মান হয়– অহংকার, হিংসা ও বিদ্বেষ ব্যক্তিগত মতবিরোধকে তীব্র করে তোলে। অন্তর পরিশুদ্ধ না হলে বাহ্যিক সমাধানও স্থায়ী ফল দেয় না।

অতএব, আত্মসমালোচনা, বিনয়, ন্যায়পরায়ণতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের চর্চাই ইখতিলাফকে সংঘাতে রূপ নেওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। অন্তরের সংস্কার ঘটলে মানুষ সমালোচনা গ্রহণে সক্ষম হয়, সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলে এবং মতভেদকে জ্ঞানবিকাশের উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

উপসংহার: ইখতিলাফ ইসলামী সমাজ ও বৌদ্ধিক ঐতিহ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান। এটি সঠিক দিকনির্দেশনা ও নীতিনিষ্ঠ ব্যবস্থাপনার অধীনে থাকলে জ্ঞানচর্চা, বিশ্লেষণধর্মিতা এবং সহনশীলতার বিকাশ ঘটায়। তবে আদব, নৈতিক সংযম ও প্রমাণনির্ভরতা অনুপস্থিত হলে ইখতিলাফ দ্রুত দলাদলি, বিদ্বেষ ও সামাজিক বিভাজনে রূপ নিতে পারে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়– যে উম্মাহ ন্যায়পরায়ণতা, প্রমাণভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং পারস্পরিক সম্মানের মাধ্যমে মতভেদ পরিচালনা করেছে, তারা শক্তিশালী ও সুসংহত হয়েছে। পক্ষান্তরে, অনিয়ন্ত্রিত ও অহংকেন্দ্রিক মতভেদ সমাজকে দুর্বল ও বিভক্ত করেছে।

অতএব, ইখতিলাফ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করার চিন্তা বাস্তবসম্মত নয়; বরং প্রয়োজন এটিকে সুশৃঙ্খল নীতিমালা, জ্ঞানভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রমাণনির্ভর বিশ্লেষণ এবং ন্যায়পরায়ণ আচরণের মাধ্যমে পরিচালিত করা। যথাযথ আদব ও নৈতিক সংযমের অধীনে মতভেদ বিভাজনের কারণ না হয়ে জ্ঞানসমৃদ্ধ বৈচিত্র্যে পরিণত হয়। তখন ইখতিলাফ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র নয়; বরং পারস্পরিক উন্নয়ন ও সমন্বয়ের মাধ্যম হয়ে ওঠে।

এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করলে দলাদলি হ্রাস পাবে, পারস্পরিক আস্থা পুনর্গঠিত হবে এবং সমাজে স্থায়ী ঐক্য ও সামষ্টিক কল্যাণ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে ইন্ শা-আল্লাহ।

---

[১] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ১০৯৬০।*

مقالات إسلامية / ইসলামী প্রবন্ধ

চূড়ান্ত বিজয় মুসলিমদেরই

সংকলনে– মোহাম্মদ ওমর ফারুক রানা*

ইসলামের ইতিহাসে প্রতিটি সংকট এবং পরীক্ষা মু'মিনদের জন্য এক মহান শিক্ষা। আপাতদৃষ্টিতে কোনো পরিস্থিতি প্রতিকূল মনে হলেও, মহান আল্লাহর হিকমতপূর্ণ পরিকল্পনা ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহর প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের মাঝেই থাকে প্রকৃত বিজয়।

১. মহান আল্লাহর ফয়সালা ও চূড়ান্ত বিজয়: ইসলামী জীবনের মূল ভিত্তি হলো মহান আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদীরের ওপর অবিচল আস্থা রাখা। ('আক্বীদাহ্ ত্বাহাভিয়্যাহ) অনেক সময় বাহ্যিক পরিস্থিতি বিশ্বাসীদের কাছে প্রতিকূল মনে হলেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদের জন্য এমন পথ তৈরি করেন, যা সুস্পষ্ট বিজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا﴾

"নিশ্চয় আমি আপনার জন্য এমন একটা ফয়সালা করে দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট বিজয়।"[১] যেকোনো কঠিন পরিস্থিতিতে আল্লাহর সিদ্ধান্তের ওপর ভরসা রাখা এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আনুগত্য করাই ইসলামের নির্দেশ। 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র এক প্রশ্নের জবাবে রাসূল (ﷺ) তাঁর ফয়সালা ও প্রতিশ্রুতির সত্যতা নিশ্চিত করেছিলেন:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضي الله عنه) قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ: «نَعَمْ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ... إِنَّهُ لَفَتْحٌ.

'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন– আমি জিজ্ঞেস করলাম: "হে আল্লাহর রাসূল! এটি কি আসলেই একটি বিজয়?" তিনি বললেন: "হ্যাঁ, সেই সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় এটি এক সুস্পষ্ট বিজয়।"[২]

২. অন্তরের প্রশান্তি ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি: যখন মু'মিনরা চরম সংকটের মুখোমুখি হয়েও নিজেদের ঈমান ও আনুগত্যের প্রমাণ দেয়, আল্লাহ তা'আলা তখন তাদের অন্তরে এক বিশেষ ঐশী প্রশান্তি অবতীর্ণ করেন, যা তাদের ঈমানকে আরো সুদৃঢ় করে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْا إِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِمْ﴾

"তিনিই মু'মিনদের অন্তরে প্রশান্তি অবতীর্ণ করেছিলেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরো ঈমান বৃদ্ধি পায়।"[৩]

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা অর্জনই মু'মিনের জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। সলফে সালেহীনদের 'আক্বীদাহ্ ও মানহাজ অনুযায়ী, 'মহান আল্লাহর সন্তুষ্ট হওয়া' তাঁর একটি প্রকৃত সিফাত বা গুণ, যা তাঁর শানের সাথে উপযুক্ত। কঠিন মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাত ধরে আনুগত্যের শপথ বা 'বায়'আতে রিদওয়ান'-এ অংশগ্রহণকারী সাহাবীদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা তাঁর এই সন্তুষ্টির কথা ঘোষণা করেছেন।

ইমাম ইবনু খুযায়মাহ্ (রহিমাহুল্লাহ)'র সুনির্দিষ্ট কিতাবী উদ্ধৃতি: "আল্লাহ মু'মিন বান্দাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন –এটি তাঁর একটি মহান গুণ (সিফাত)। তিনি যেভাবে ইচ্ছা তাঁর বান্দার ওপর সন্তুষ্ট হন, যা তাঁর মর্যাদার সাথে সমাদৃত।"[৪]

আল্লাহ সাহাবীদের অন্তরের সততা ও একনিষ্ঠতা সম্পর্কে অবগত ছিলেন বলেই তাদের প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন এবং পরকালে তাদের জন্য চিরস্থায়ী জান্নাতের ফয়সালা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿لَّقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾

"আল্লাহ মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার কাছে বায়'আত গ্রহণ করল।"[৫]

যে ব্যক্তিরা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য জীবন বাজি রেখে আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলেন, সেই শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের জন্য রয়েছে পরকালের পরম মুক্তি ও জাহান্নাম থেকে নাজাতের নিশ্চয়তা।

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): «لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِمَّنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ.

---

*সাবেক সিনিয়র লাইব্রেরিয়ান, আহলে হাদীস লাইব্রেরি, ঢাকা এবং পরিচালক, উসওয়া পাবলিকেশন্স।

[১] সূরা আল-ফাত্হ: ১।

[২] সহীহ বুখারী- হা. ৪৮১৮।

[৩] সূরা আল-ফাত্হ: ৪।

[৪] কিতাবুত তাওহীদ ওয়া ইসবাতু সিফাতির রব্ব আজ্জা ওয়া জাল্লা- ১ম খণ্ড, অধ্যায়- ২৯: "বাবুজ যিকরি বিয়ান্নাল্লাহা জিল্লা ওয়া ইয্যা ইয়ারদ্বা আনিল মু'মিনীন"।

[৫] সূরা আল-ফাত্হ: ১৮।

জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তিরা গাছের নিচে বায়'আত (শপথ) করেছিল, তাদের কেউই জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।"[১]

৩. মহান আল্লাহর প্রতিশ্রুতির সত্যতা ও মু'মিনদের নিরাপত্তা: আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (ﷺ) ও মু'মিনদের যে স্বপ্ন ও প্রতিশ্রুতি দেখান, তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হয়। পৃথিবীতে তাওহীদের প্রতিষ্ঠা এবং মু'মিনদের নিরাপত্তা মহান আল্লাহর অন্যতম বড় নেয়ামত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন:

﴿لَّقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ ۖ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللهُ آمِنِيْنَ﴾

"অবশ্যই আল্লাহ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ যদি চান, তবে তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে।"[২]

৪. সাহাবায়ে কেরামের অনন্য বৈশিষ্ট্য– কাফেরদের প্রতি কঠোর ও পারস্পরিক দয়া: পবিত্র কুরআনে সাহাবায়ে কেরামের 'আক্বীদাহ্, 'আমল ও চরিত্রের এক অতুলনীয় চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। সলফে সালেহীনদের পথ অনুসরণে সাহাবীদের এই আদেশকে ইবাদত ও আচরণের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করা আবশ্যক।[৩] তারা দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে যেমন আপসহীন ও বজ্রকঠিন, নিজেদের মধ্যে তেমনই পরম সহমর্মী। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿مُّحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ ۚ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُوْدِ﴾

"মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর সাথে যারা রয়েছে তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে দয়াশীল। আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত অবস্থায় আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করতে দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে সেজদার চিহ্ন বিদ্যমান থাকবে।"[৪]

ইমাম কুরতুবী (রহিমাহুল্লাহ) এই আয়াতের তাফসীরে বলেন, সাহাবায়ে কেরামের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তারা মহান আল্লাহর হক্বের ব্যাপারে আপসহীন ছিলেন, কিন্তু নিজের ভাইয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উদারতা দেখাতেন। তাদের চেহারার সেজদার চিহ্ন কোনো কৃত্রিম দাগ নয়; বরং দীর্ঘ ইবাদত ও বিনয়ের কারণে চেহারায় যে নূর বা জ্যোতি প্রকাশ পেত, এটি তারই বহিঃপ্রকাশ।[৫]

৫. মূল শিক্ষা (সলফে সালেহীনদের পথ অনুসরণে)– তাকদীরে অবিচল বিশ্বাস: মহান আল্লাহর দূরদর্শী হিকমত ও পরিকল্পনা মানুষের সীমিত বুদ্ধির অতীত। আপাত কোনো কষ্ট বা পরীক্ষার পেছনেও মু'মিনদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী কল্যাণ ও মহাবিজয় থাকে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ): «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ... وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ, فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا, وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ...

মু'মিনদের এই বিশ্বাস থাকা উচিত যে ভালো-মন্দ সবই মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন।[৬]

সুন্নাহর নিঃশর্ত আনুগত্য: যেকোনো পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সহীহ সুন্নাহর প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পণ ও নিঃশর্ত আনুগত্যই সফলতার একমাত্র চাবিকাঠি।[৭]

সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ: 'আক্বীদাহ্, 'আমল ও ইবাদতের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের মানহাজ বা পদ্ধতি অনুসরণ করাই সরল পথ (সিরাতুল মুস্তাকীম)।[৮]

ঐশী প্রশান্তি: ঈমান ও তাওহীদের পরীক্ষায় যারা অবিচল থাকে, আল্লাহ তা'আলা তাদের অন্তরে পরম শান্তি ও স্থিরতা অবতীর্ণ করেন।[৯]

পরিশেষে– ইসলামের প্রতিটি সংকট মূলত মু'মিনদের ঈমানী পরিপক্কতা ও বিজয়ের সোপান। বাহ্যিক প্রতিকূলতা যতই আসুক না কেন, মহান আল্লাহর সুনিশ্চিত ফয়সালা, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহর নিঃশর্ত আনুগত্য এবং সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের ওপর অবিচল থাকার মাঝেই নিহিত রয়েছে ইসলামের চূড়ান্ত বিজয়। ইতিহাসের চাকা প্রমাণ করে– অন্ধকার যতই গভীর হোক, সত্যের আলোয় মু'মিনদের চূড়ান্ত বিজয় অবধারিত।

---

[১] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৪৯৬।*
[২] *সূরা আল-ফাত্হ: ২৭।*
[৩] *শরহু উসূলি ই'তিকাদি আহলিস সুন্নাহ- ইমাম লালাকাঈ।*
[৪] *সূরা আল-ফাত্হ: ২৯।*
[৫] *তাফসীরুল কুরতুবী- ১৬শ খণ্ড, পৃ. ৩২৪-৩২৬; সূরা আল-ফাত্হ: ২৯ নং-এর ব্যাখ্যা।*
[৬] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৫৩।*
[৭] *সূরা আন-নিসা: ৬৫।*
[৮] *সূরা আত্-তাওবাহ্: ১০০।*
[৯] *সূরা আর্-রা'দ: ২৮।*

التربيةوالحضارة / শিক্ষা ও সভ্যতা

ইসলাম ও আধুনিক সভ্যতার আন্তঃসম্পর্ক: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

সভ্যতা বলতে সাধারণত: একটি সমাজের জ্ঞান, শিক্ষা, নৈতিকতা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি, আইন, শিল্পকলা ও নানাবিধ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত বিকাশকে বোঝায়। ইসলামের দৃষ্টিতে সভ্যতা কেবল বস্তুগত উন্নয়নের নাম নয়; বরং এমন একটি জীবনব্যবস্থা, যেখানে মানবকল্যাণ, ন্যায়বিচার, নৈতিকতা এবং মহান আল্লাহর আনুগত্যের সমন্বয়ে ব্যক্তি ও সমাজের ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ণ সাধিত হয়। এসব কারণে ইসলামি সভ্যতা মূলতঃ একটি মূল্যবোধ ভিত্তিক ও মানবকেন্দ্রিক সভ্যতা।

ইসলামে সভ্যতার মূল ভিত্তি হলো তাওহীদ। তাওহীদের শিক্ষা মানুষকে এক মহান আল্লাহর ইবাদাত, মানব সমতা এবং ন্যায় বিচারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত সহ আরও তিনটি ইবাদত মানুষকে বহুবিধ গুণে গুনান্বিত করে। প্রকৃত মানুষ হওয়ার কারণে সে সমাজের জন্য আশীর্বাদ বিবেচিত হয়। এর মাধ্যমে বিকশিত হয় মনুষত্ব। ইসলামের মতে মানুষ পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি (খলিফা)। তাই পৃথিবীকে আবাদ করা, জ্ঞানচর্চা করা, ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং মানব কল্যাণে কাজ করা মানুষের দায়িত্ব। এতদকারণে কুরআনুল কারীমে বিম্বিত হয়েছে–

"আমি পৃথিবীতে একজন প্রতিনিধি (খলিফা) সৃষ্টি করতে যাচ্ছি।"[১]

এই সংক্ষিপ্ত আয়াতে কারীমা থেকে অনুভূত হয় যে, সভ্যতা নির্মাণ ও গ্রহটির উন্নয়ণ সাধন মানুষেরই দায়িত।

জ্ঞানভিত্তিক সভ্যতার দ্বারোদ্ঘাটন ইসলামের একক কর্তৃত্ব। জ্ঞানই হলো ইসলামি সভ্যতার প্রধান ভিত্তি। ইসলামের প্রথম ওহিই ছিল- 'পড়ো (اِقْرَأْ)। বলা বাহুল্য এতেই প্রমাণিত হয় যে, ইসলামি সভ্যতার সূচনা জ্ঞানচর্চা আহ্বানের মাধ্যমে। জ্ঞানের সমধিক গুরুত্ব স্থান পেয়েছে কুরআনুল কারীমের ৩৯ নং সূরাতে। সেখানে বলা হয়েছে–

"বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে?"[২]

এসব আয়াত জ্ঞান, গবেষণা ও চিন্তাশীলতার উপর ইসলামের গুরুত্ব স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

টেকসই সভ্যতার অন্যতম উপাদান হলো নৈতিকতা ও ন্যায়বিচার। ইসলামি সভ্যতা কোন প্রযুক্তিগত বা অর্থনৈতিক অগ্রগতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং নৈতিক চরিত্র ও ন্যায়বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। "আপন কন্যাও যদি অপরাধী সাব্যস্ত হয় তবে তাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে"- মহানবীর এই বাচনিক উদ্ধৃতি সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ও সমতা বিধানের বজ্রকঠিন অভিমত বিশ্বকে অবাক করে তোলে। শিরোচ্ছেদ কিংবা প্রস্তারাঘাতে হত্যা নির্মমতা নয়; বরং একটি ফুলেল সমাজ বিনির্মাণের অনুঘটক হিসেবে বিবেচিত হয়। কুরআনুল হাকীমে সত্যবাদীতা, আমানতদারীতা, ইনসাফ, দয়া ও মানবিকতা শিক্ষা দেয়। শাস্তির মুখোমুখি এক মহিলার অবস্থা দৃষ্টে দয়ার নবী অশ্রুসংবরণ করতে পারছিলেন না। এমতাবস্থায় মহিলাকে ক্ষমা করে দেওয়ার অনুরোধ তাঁর গোচরীভূত হলে তিনি মহান আল্লাহর বিধানের অকাট্যতা ও অনুশীলনের মাধ্যমে বৃহত্তর সমাজের অধিকতর কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি যে, সততা, সমতা ও নৈতিক মূল্যবোধ একটি সমাজের টেকসই সভ্যতার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

[চলবে ইন্ শা-আল্লাহ]

---

* **প্রফেসর ও চেয়ারম্যান,** ইসলামের ইতিহাস ও সভ্যতা বিভাগ, **পরিচালক,** এশিয়ান ইন্সটিটিউট এবং **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এ. ইউ. বি।

[১] *সূরা আল-বাক্বারাহ: ৩০।*

[২] *সূরা আয্-যুমার: ৯।*

قصص القرآن / ক্বাসাসুল কুরআন

ক্ষুদে গোয়েন্দা হুদহুদ

আবূ তাহসীন মুহাম্মদ

সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) ছিলেন সারাবিশ্ব শাসন করা একজন নবী। তিনি মানুষ, জিন্, বায়ুমণ্ডল, পশু-পাখি, প্রাণী ইত্যাদি শাসন করতেন। এদের ভাষাও বুঝতেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে এই ক্ষমতা দিয়েছিলেন। তার অধীনে বিশেষ কিছু পাখি ছিল রাজকর্মে নিয়োজিত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি পাখি ছিল হুদহুদ। এ পাখির দায়িত্ব ছিল সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) মরুভূমি বা জনমানবহীন প্রান্তরে বের হলে পানি অন্বেষণ করা। একবার হঠাৎ করেই হুদহুদ পাখি উধাও হয়ে গেল। কিছু না জানিয়ে এভাবে উধাও হওয়ায় সুলাইমান (আলাইহিস সালাম) রাগান্বিত হলেন এবং যথাযথ কারণ দর্শাতে না পারলে কঠিন শাস্তি প্রদানের ওয়াদা করলেন।

কিছুক্ষণ পর হুদহুদ ফিরে আসে এবং এক চমকপ্রদ সংবাদ দেয়। সে জানায়, আমি এমন এক তথ্য এনেছি যা আপনি জানেন না। আমি সাবা নামক জনপদ থেকে সঠিক সংবাদ এনেছি। সেখানে একজন নারী শাসন করে। তার রয়েছে সুবৃহৎ সিংহাসন, প্রাচুর্য ও প্রভাব। কিন্তু আফসোস, সে ও তার জাতি মহান আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যের উপাসনা করে। একটি পাখির মুখে এমন পর্যবেক্ষণ এবং ধর্মীয় মূল্যায়ন আমাদের ভাবিয়ে তোলে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এ ঘটনা সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন:

﴿وَ تَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ ۫ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ۝ لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاذْبَحَنَّهٗۤ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ۝ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ ۝ اِنِّيْ وَجَدْتُّ امْرَاَةً تَمْلِكُهُمْ وَ اُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّ لَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ ۝ وَجَدْتُّهَا وَ قَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ﴾

"সুলায়মান পাখিরদলের সন্ধান নিলো এবং বলল, 'ব্যাপার কি, হুদহুদকে দেখছি না যে! সে অনুপস্থিত না-কি? সে উপযুক্ত কারণ না দর্শালে আমি অবশ্যই তাকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা যবেহ্ করব।' কিছুক্ষণ পরেই সে এসে বলল, 'আপনি যা অবগত নন আমি তা অবগত হয়েছি এবং 'সাবা' হতে সুনিশ্চিত এক সংবাদ নিয়ে এসেছি। 'আমি তো এক নারীকে দেখলাম তাদের ওপর রাজত্ব করছে। তাকে সকল কিছু দেয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন। 'আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজ্দা করছে। শয়তান তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভন করেছে এবং তাদেরকে সৎপথ হতে নিবৃত্ত করেছে, ফলে তারা সৎপথ পায় না।"[১]

আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও এখন এ কথাটি পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, প্রাণীদের মধ্যে রয়েছে অনুভূতি, বুদ্ধিমত্তা ও বিশ্লেষণ করার সক্ষমতা। প্রাণীর আচরণ নিয়ে বহু গবেষণায় দেখা গেছে, অনেক পাখি দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নিতে পারে, ঝুঁকি মূল্যায়ন করতে পারে, এমনকি নিজেদের এলাকা ও শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে পারে। পাখিবিষয়ক গবেষণামূলক বিভিন্ন বইয়ে এমন অনেক তথ্য পাওয়া যায়, যা প্রাণীদের অভূতপূর্ব সক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা দেয়।

হুদহুদের বর্ণনার মধ্যে আরো একটি বিষয় চোখে পড়ে। সে শুধু সংবাদ বহন করেনি; বরং তা বিশ্লেষণও করেছে। বলেছে, তারা সূর্য পূজা করে, যা সঠিক নয়। এই ভাষায় তার ভেতরকার ঈমান, তাওহিদের প্রতি ভালোবাসা এবং সত্য-অসত্যের পার্থক্য করার সক্ষমতা প্রকাশ পায়। এটও বোঝা যায়, সুলায়মান (আলাইহিস সালাম)-এর সংস্পর্শ ও প্রশিক্ষণে সে একটি দায়িত্ববান সত্তায় পরিণত হয়েছিল।

সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) এরপর হুদহুদের মাধ্যমে একটি পত্র প্রেরণ করেন সাবার নারী শাসকের কাছে। এভাবে হুদহুদ শুধু সংবাদদাতা নয়; বরং এক অর্থে কূটনৈতিক দূতের ভূমিকাও পালন করে। তার ডানায় ভর করে এক নবীর বার্তা পৌঁছে যায় এক নারী শাসকের

[১] *সূরা আন্-নামল; ২০-২৪।*

দরবারে। এরপর শুরু হয় এক নতুন ইতিহাস, যেখান থেকে একজন নারী শাসক সত্যের পথে ফিরে আসেন, মহান আল্লাহর প্রতি নত হন।

'হুদহুদ' এক জাতীয় ছোট্ট পাখির নাম। যা পক্ষীকুলের মধ্যে অতীব ক্ষুদ্র ও দুর্বল এবং যার সংখ্যা দুনিয়াতে খুবই কম। বর্ণিত আছে যে, 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) একদা নও মুসলিম ইহুদী পণ্ডিত 'আব্দুল্লাহ ইবনু সালাম (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞেস করেন, এতসব পাখী থাকতে বিশেষভাবে 'হুদহুদ' পাখির খোঁজ নেওয়ার কারণ কি ছিল? জওয়াবে তিনি বলেন, সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) তাঁর বিশাল বাহিনীসহ ঐসময় এমন এক অঞ্চলে ছিলেন, যেখানে পানি ছিল না। আল্লাহ তা'আলা হুদহুদ পাখিকে এই বৈশিষ্ট্য দান করেছেন যে, সে ভূগর্ভের বস্তুসমূহকে এবং ভূগর্ভে প্রবাহিত পানি ওপর থেকেই দেখতে পায়। সুলায়মান (আলাইহিস সালাম) হুদহুদকে এজন্যেই বিশেষভাবে খোঁজ করছিলেন যে, এতদঞ্চলে কোথায় মরুগর্ভে পানি লুক্কায়িত আছে, সেটা জেনে নিয়ে সেখানে জিন দ্বারা খনন করে যাতে দ্রুত পানি উত্তোলনের ব্যবস্থা করা যায়'। একদা 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) 'হুদহুদ' পাখি সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন। তখন নাফে' ইবনুল আযরক্ব তাঁকে বলেন,

قِفْ يا وَقَّافُ! كيف يَرَى الهدهدُ باطنَ الأرضِ وهو لا يَرَى الْفَخَّ حِيْنَ يَقَعُ فيه.

জেনে নিন হে মহা জ্ঞানী! হুদহুদ পাখি মাটির গভীরে দেখতে পায়। কিন্তু (তাকে ধরার জন্য) মাটির উপরে বিস্তৃত জাল সে দেখতে পায় না। যখন সে তাতে পতিত হয়। জবাবে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

إذا جاء القَدَرُ عَمِيَ البَصَرُ.

'যখন তাক্বদীর এসে যায়, চক্ষু অন্ধ হয়ে যায়'। চমৎকার এ জবাবে মুগ্ধ হয়ে ইবনুল আরাবী বলেন,

لايَقْدِرُ على هذا الجوابِ إلا عالِمُ القرانِ.

এরূপ জওয়াব দিতে কেউ সক্ষম হয় না, কুরআনের আলেম ব্যতীত।[১]

[১] তাফসীর কুরতুবী- সূরা আন্-নামল, ২০ নং আয়াত দ্র.।

الأحداث الجارية / সাময়িক প্রসঙ্গ

বিশ্বকাপের উন্মাদনা নাকি ঈমানের অবক্ষয়?

মো. রেদুয়ান বিন রফিকুল ইসলাম*

ভূমিকা: যখন বিশ্বকাপের বাঁশি বাজে, তখন পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ যেন এক অদৃশ্য আবেগের স্রোতে ভেসে যায়। শহরের অলিগলি, গ্রামের মেঠোপথ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র –সবখানেই ছড়িয়ে পড়ে ফুটবল উন্মাদনা। পতাকা উড়ে, রাত জেগে খেলা দেখা হয়, তর্ক-বিতর্কে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সমাজ। কিন্তু একজন মুসলমানের জন্য প্রশ্ন হলো– এই উন্মাদনা কি কেবল বিনোদন, নাকি ধীরে ধীরে তা ঈমানের অবক্ষয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে?

এটি শুধু খেলাধুলার প্রশ্ন নয়; এটি একজন মু'মিনের হৃদয়ের অগ্রাধিকার, সময়ের মূল্য, ভালোবাসার কেন্দ্রবিন্দু এবং মহান আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্ন।

যখন খেলার প্রতি ভালোবাসা ইবাদতের চেয়েও বড় হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ﴾

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে নেয় এবং তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালোবাসে। আর মু'মিনগণ আল্লাহকেই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।"[২]

আজ অনেক মানুষ এমনভাবে প্রিয় খেলোয়াড়দের অনুসরণ করে যে, তাদের নাম শুনলে আবেগে আপ্লুত হয়; কিন্তু রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সুন্নাহর কথা শুনলে সেই আবেগ দেখা যায় না। কোনো খেলোয়াড়ের জীবনী মুখস্থ থাকে, অথচ সাহাবায়ে কেরামের জীবনের মৌলিক ঘটনাও জানা থাকে না। এটি আত্মসমালোচনার বিষয়।

* মুদাররিস, মাদ্‌রাসা তা'মীরুল হায়াত, পঞ্চগড়।
[২] সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৬৫।

বিশ্বকাপ: আনন্দের উৎস নাকি সময় ধ্বংসের কারখানা? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন–

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ.

"দু'টি নিয়ামতের ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত –সুস্বাস্থ্য ও অবসর সময়।"[১]

বিশ্বকাপের মৌসুমে লক্ষ্য করা যায়, মানুষ রাতের পর রাত জেগে খেলা দেখে। ফজরের সালাত কাযা হয়, কুরআন তিলাওয়াত কমে যায়, যিক্‌র ও ইবাদতের প্রতি আগ্রহ হ্রাস পায়। একজন মুসলমানের কাছে সময় হলো জীবনের মূলধন; অথচ সেই মূলধন কখনো কখনো একটি গোল, একটি ম্যাচ কিংবা একটি ট্রফির পেছনে ব্যয় হয়ে যায়।

মুসলিম উম্মাহর কান্না বনাম বিশ্বকাপের উল্লাস: একদিকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলমানরা নির্যাতিত, ক্ষুধার্ত ও উদ্বাস্তু; অন্যদিকে কোটি কোটি মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলোয়াড়দের জয়-পরাজয় নিয়ে উদ্বিগ্ন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ﴾

"নিশ্চয়ই মু'মিনরা পরস্পর ভাই ভাই।"[২]

প্রশ্ন হলো– আমাদের হৃদয় কি উম্মাহর কষ্টে কাঁদে, নাকি কেবল প্রিয় দলের পরাজয়ে ভেঙে পড়ে? এই প্রশ্নের উত্তরই আমাদের হৃদয়ের প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করে।

অন্ধ সমর্থন ও বিভক্তির সংস্কৃতি: বিশ্বকাপের সময় বন্ধুত্ব নষ্ট হয়, আত্মীয়তার সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমনকি মারামারি পর্যন্ত ঘটে। অথচ ইসলাম ঐক্যের শিক্ষা দেয়। রাসূল (ﷺ) বলেছেন–

لَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا.

"তোমরা পরস্পর হিংসা করো না, বিদ্বেষ পোষণ করো না এবং একে অপরের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না; বরং মহান আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে থাকো।"[৩]

যেখানে একটি খেলা মানুষকে বিভক্ত করে, সেখানে একজন মু'মিনকে সতর্ক হতে হবে।

খেলা কি সম্পূর্ণ হারাম? ইসলাম বৈধ বিনোদনকে নিষিদ্ধ করেনি। রাসূল (ﷺ) নিজে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন, সাহাবাদের ক্রীড়া-চর্চাকে উৎসাহ দিয়েছেন। শরীরচর্চা ও খেলাধুলা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ, যদি তা– ফর্‌য ইবাদত থেকে গাফেল না করে, অশ্লীলতা ও হারাম কাজে না জড়ায়, সময়ের অপচয় না ঘটায়, অন্ধ ভক্তি সৃষ্টি না করে, ইসলামী আদর্শের বিরোধিতা না করে।

অতএব সমস্যা ফুটবল নয়; সমস্যা হলো ফুটবলকে জীবনের কেন্দ্রবিন্দু বানানো।

ঈমানের মানদণ্ডে বিশ্বকাপ: একজন মুসলমানের কাছে সবচেয়ে বড় বিজয় বিশ্বকাপ জয় নয়; বরং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। সবচেয়ে বড় ট্রফি সোনার কাপ নয়; বরং জান্নাত। সবচেয়ে বড় উদযাপন কোনো দলের শিরোপা নয়; বরং কিয়ামতের দিন নাজাত লাভ। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾

"যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সেই-ই প্রকৃত সফলকাম।"[৪]

উপসংহার: বিশ্বকাপের উন্মাদনা সাময়িক; কিন্তু ঈমানের আলো চিরস্থায়ী। ফুটবলের উত্তেজনা কয়েক দিনের, কিন্তু আখিরাতের জীবন অনন্তকালের। একজন মু'মিন খেলাকে বিনোদনের পর্যায়ে রাখবে, কিন্তু কখনোই তা তার হৃদয়ের সিংহাসনে বসতে দেবে না।

আজ প্রয়োজন আত্মসমালোচনার– আমার হৃদয় কি মহান আল্লাহর স্মরণে বেশি আন্দোলিত হয়, নাকি একটি ফুটবল ম্যাচে? এই প্রশ্নের উত্তরই নির্ধারণ করবে– বিশ্বকাপ আমার জন্য কেবল একটি খেলা, নাকি ঈমানের অবক্ষয়ের সূচনা।

---

[১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪১২।*
[২] *সূরা আল-হুজুরা-ত: ১০।*
[৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০৬৬।*
[৪] *সূরা আ-লি-'ইমরান: ১৮৫।*

عَالَمُ النِّسَاءِ / মহিলা জগত

কুরআন হাদীসের আলোকে নারীদের মসজিদে সালাত আদায়ের বিধান

আবু আব্দুল্লাহ জনি আহমাদ

ভূমিকা: ঢাকাকে বলা হয়ে থাকে মসজিদের শহর, এছাড়াও এই দেশের আনাচে কানাচে রয়েছে মসজিদ। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় মসজিদের বাহিরে দূরে কোথাও হিজাব নিকাব করে পর্দা করা মহিলারা তাদের স্বামী, ভাই অথবা বাবার জন্য অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে যে, কখন তারা মসজিদে সালাত আদায় শেষ করে বের হবে। এছাড়াও প্রায়ই দেখা যায় জরুরি প্রয়োজনে পরিবার নিয়ে বাহিরে যাওয়া অথবা সফরে যাওয়ার সময় একদল সালাত আদায়কারী পুরুষেরা তাদের সাথে থাকা নারীদেরকে নিয়ে বিপাকে পড়ে যায় সালাতের ওয়াক্ত পাড় হয়ে যাচ্ছে কিন্তু তাদের সাথে থাকা নারীরা তাদের সালাত কোথায় আদায় করবে? কারণ এই দেশের প্রচলিত মসজিদগুলো বাহিরে থেকে দেখতে বেশ চাকচিক্য হলেও তাতে নারীদের সালাত আদায়ের মতো কোনো পরিবেশ নেই, ব্যবস্থাও নেই! কিন্তু আপনি যদি আরব ভুখন্ডের দিকে তাকান তবে দেখতে পাবেন প্রতিটি দেশের প্রায় মসজিদেই মহিলাদের সালাত আদায়ের জন্য পৃথক ও সুন্দর ব্যবস্থাপনা রয়েছে। ইউরোপ, আমেরিকা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, অস্ট্রেলিয়ার মসজিদগুলোতেও মহিলাদের জন্য সালাত আদায়ের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা এমন কেন? মেয়েরা এই দেশে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, মাদ্‌রাসা, মার্কেট, অফিস, শপিংমল, স্টেডিয়াম সকল জায়গাতেই বিনা বাঁধায় যেতে পারলেও মসজিদে যাওয়া যেন মেয়েদের জন্য অঘোষিত হারাম বা নিষিদ্ধ! কিন্তু বাস্তবতা আসলে কি? কুরআন হাদীসের আলোকে আসলেই কি মহিলাদের মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই আমাদের আজকের এই প্রবন্ধ। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتۡ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ كِتَٰبٗا مَّوۡقُوتٗا﴾

"নিশ্চয় সালাত মু'মিনদের ওপর নির্দিষ্ট সময়ে ফরয।"[১]

অর্থাৎ- মু'মিন নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই আল্লাহ তা'আলা সালাতকে নির্দিষ্ট সময়ে ফর্‌য করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۘ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ يُطِيْعُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ﴾

"আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[২]

অর্থাৎ- মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভালো কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়িম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা যত আদেশ-নিষেধ করেছেন তার সর্বোত্তম বাস্তবায়নকারী হচ্ছেন নবী (ﷺ) এবং তার সাহাবায় কেরাম। অর্থাৎ- সালাফগণ হচ্ছেন আমাদের জন্য একমাত্র উত্তম আদর্শ এবং অনুকরণীয়। মেয়েদের সালাত আদায়ের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এবং তার সাহাবায় কেরামের বক্তব্য এবং 'আমলই আমাদের জন্য যথেষ্ট।

নারীদের জন্য মসজিদে সালাত আদায়ের বৈধতার স্বপক্ষে যেই দলিলগুলো পাওয়া যায়: হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ "لَا تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ".

ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মহান আল্লাহর বান্দীদের মহান আল্লাহর মসজিদে যেতে বাঁধা দিও না।[৩]

অর্থাৎ- উপরোক্ত হাদীসে রাসূল (ﷺ) মহান আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে যেতে বাঁধা প্রদান করতে নিষেধ করেছেন। অপর এক হাদীসে এসেছে,

[১] *সূরা আন্-নিসা: ১০৩।*

[২] *সূরা আত্-তাওবাহ: ৭১।*

[৩] *সহীহ মুসলিম- হা. এ., ৮৭৬।*

يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ "إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوْا لَهُنَّ".

ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের স্ত্রীগণ মসজিদে যেতে অনুমতি চাইলে তাদেরকে মসজিদে যেতে অনুমতি দিবে।[১]

অর্থাৎ- কোনো স্ত্রীলোক যদি শরীয়তের নির্দেশনা মেনে তার স্বামী, ভাই অথবা বাবার কাছে মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায় তবে তাদেরকে অনুমতি প্রদান করতে নবী (ﷺ) নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীসে এসেছে,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأْذَنُوْا لَهُنَّ.

ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেছেন, যদি তোমাদের স্ত্রীরা রাতের বেলা মসজিদে আসতে চায় তাহলে তাদের অনুমতি দিবে।[২]

উপরোক্ত হাদীসটি ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) তার সহীহুল বুখারী’র “রাতে ও অন্ধকারে মহিলাগণের মসজিদের দিকে বের হওয়া” শিরোনামে ১০/১৬২তম অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন। উক্ত হাদীসেও রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নারীরা মসজিদে যেতে চাইলে তাদেরকে অনুমতি দিতে নির্দেশ করেছেন। অপর এক হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلاَةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيْلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِيْنَ وَقَدْ تَعْلَمِيْنَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذٰلِكَ وَيَغَارُ قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِيْ قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) لَا تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ".

ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র স্ত্রী (‘আত্বিক্বাহ্ বিনতু যায়দ) ফজর ও ‘ইশার সালাতের জামা‘আতে মসজিদে হাযির হতেন। তাঁকে বলা হলো, আপনি কেন (সালাতের জন্য) বের হন? অথচ আপনি জানেন যে, ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তা অপছন্দ করেন এবং মর্যাদা হানিকর মনে করেন। তিনি জবাব দিলেন, তা হলে কিসে বাধা দিচ্ছে যে, ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) স্বয়ং আমাকে নিষেধ করছেন না? বলা হলো, তাঁকে বাধা দেয় আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর বাণী: আল্লাহর দাসীদের আল্লাহর মসজিদে যেতে বারণ করো না।[৩]

অর্থাৎ- ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র স্ত্রী (‘আত্বিক্বাহ্ বিনতু যায়দ) ফজর ও ‘ইশার সালাতের জামা‘আতে মসজিদে হাযির হতেন, কিন্তু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাকে সরাসরি নিষেধ করতে পারতেন না শুধুমাত্র রাসূল (ﷺ)-এর আদেশ ও নির্দেশকে মেনে নেয়ার কারণে। হাদীসে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "لَا تَمْنَعُوْا النِّسَاءَ مِنَ الْخُرُوْجِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ". فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لَا نَدَعُهُنَّ يَخْرُجْنَ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا. قَالَ فَزَبَرَهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ أَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) وَتَقُوْلُ لَا نَدَعُهُنَّ.

ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা রাত্রিকালে স্ত্রীলোকদের মসজিদে যেতে নিষেধ করবে না, তখন তার পুত্র বলল, আমরা তাদেরকে নিষেধ করব, যাতে তারা ছলনা করতে না পারে। তখন তিনি তার পুত্রকে তিরস্কার করার পর বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশ শোনাচ্ছি, আর তুমি তার বিরোধিতা করে বলছ যে, আমরা তাদের ছেড়ে দিব না![৪]

অর্থাৎ- ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নারীদের মসজিদে যাওয়ার বিষয়টিকে অপছন্দ করলে এবং বাঁধা দিতে ইচ্ছা পোষণ করলে সয়ং ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার নিজ পুত্রকে তিরস্কার করলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশের ব্যাপারে সতর্ক করলেন। এই হাদীস প্রমাণ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশ পালনে এবং তার হুকুম বাস্তবায়নে সাহাবায়ে কেরাম কতোটা তৎপর ছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কথা শোনা মাত্রই তারা এক বাক্যে তা মেনে নিতেন, পৃথিবীর কোনো ব্যক্তির কথাকে অগ্রাধিকার না দিয়ে; বরং রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাদীসের প্রতি তারা সর্বোচ্চ আনুগত্য প্রদর্শন করতেন। হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ إِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ، مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.

[১] সহীহ মুসলিম- ই. ফা. বাং, ৮৭৫।
[২] সহীহ বুখারী- হু. আ. মা. প্র., ৮৬৫।
[৩] সহীহ বুখারী- হু. আ. মা. প্র., ৯০০।
[৪] সহীহ মুসলিম- ই. ফা. বাং, ৮৭৬।

'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) যখন ফজরের সালাত শেষ করতেন তখন নারীরা চাদরে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করে ঘরে ফিরতেন। অন্ধকারের দরুণ তখন তাঁদেরকে চেনা যেতো না।"[১]

অর্থাৎ- নবী (ﷺ)-এর সাথে ফজরের সালাতে অনেক মু'মিন মহিলা চাদর দিয়ে গা ঢেকে শরীক হতো আবার সালাত শেষ করে চলেও যেতো আর তাঁদের কেউ চিনতে পারত না। সুতরাং নারীদের জন্য যদি মসজিদে যাওয়া নিষিদ্ধই হতো তবে নিশ্চই এই উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানুষেরা সেই নিষিদ্ধ কাজ করতেন না। অপর এক হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) قَالَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, (ইমামের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য) পুরুষদের বেলায় তাসবীহ সুবহানাল্লাহ্ বলা। তবে মহিলাদের বেলায় 'তাসফীক' (এক হাতের তালু দিয়ে অন্য হাতের তালুতে মারা)।[২]

অর্থাৎ- ইমাম যদি সালাতে ভুল করে তবে পুরুষ মুসুল্লিগণ সুবহানাল্লাহ বলে ইমামকে সংশোধনী দিবেন এবং এক্ষেত্রে যদি পুরুষগণ সুবহানাল্লাহ্ বলতে ভুলে যান তবে নারী মুসুল্লিগণ এক হাতের তালু দিয়ে অন্য হাতের তালুতে মেরে শব্দ করে 'তাসফীক'-এর মাধ্যমে ইমামকে সতর্ক করবেন। এইখানে আরেকটা বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে নারীরা নিজেদের কণ্ঠের পর্দার কারণে সুবহানাল্লাহ না বলে; বরং হাতের তালুতে শব্দ করবেন। এখন কথা হচ্ছে যে, যদি মহিলাদের মসজিদে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধই হয় তবে মহিলাদের জন্য 'তাসফীক'-এর বিধান আসে কোথায় থেকে? এই হাদীসের আলোকে আরো প্রমাণিত হয় যে ইমাম ভুল করলে আল্লাহু আকবার নয়; বরং সুবহানাল্লাহ বলে ইমামের ভুল সংশোধনের জন্য লোকমা দিতে হয়। উক্ত হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) তার সহীহ মুসলিমের "সালাতে মহিলাদের 'তাসফীক' (হাত তালি দেয়া)" শিরোনামে ২১/৫তম অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন। হাদীসে এসেছে,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِيْ أُزُرِهِمْ فِي أَعْنَاقِهِمْ مِثْلَ الصِّبْيَانِ مِنْ ضِيْقِ الأُزُرِ خَلْفَ النَّبِيِّ (ﷺ) فَقَالَ قَائِلٌ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُءُوْسَكُنَّ حَتّٰى يَرْفَعَ الرِّجَالُ.

সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (ﷺ)-এর পিছনে পুরুষদেরকে তাদের লুঙ্গি খাটো হওয়ার কারণে বালকদের মতো কাঁধের সাথে গিট দিয়ে তহবন্দ গলায় বেঁধে পরিধান করতে দেখেছি। এক ব্যক্তি বলে উঠল, হে নারী সমাজ! পুরুষদের মাথা উঠানোর আগে তোমরা মাথা উঠাবে না।[৩]

উপরোক্ত হাদীসেও নারীদেরকে মসজিদে সালাত আদায় কালে পুরুষদের মাথা উঠানোর পরে তাদের মাথা উঠাতে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এখন নারীদের মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করা যদি নিষিদ্ধই হয় তবে এই নির্দেশ এর আওতাভুক্ত তারা কিভাবে হতে পারে? উক্ত হাদীসটিও ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) তার সহীহ মুসলিমের "পুরুষদের সাথে যেসব মহিলা জামা'আতে শারীক হয়ে সালাত আদায় করে তাদের প্রতি নির্দেশ হলো, পুরুষ মুসল্লীরা সিজদা থেকে মাথা না উঠানো পর্যন্ত তারা মাথা উঠাবে না" শিরোনামে ২৯তম অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন। হাদীসে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا".

"আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, পুরুষদের জন্য প্রথম লাইন উত্তম এবং শেষের লাইন মন্দ। মহিলাদের জন্য শেষের লাইন উত্তম এবং প্রথম লাইন মন্দ।"[৪]

অর্থাৎ- নারীদের জন্য যদি মসজিদে সালাত আদায় করা নিষিদ্ধই হয়ে থাকে তবে পুরুষদের জন্য প্রথম লাইন উত্তম এবং শেষের লাইন মন্দ। মহিলাদের জন্য শেষের লাইন উত্তম এবং প্রথম লাইন মন্দ এমন কথা কেন আসবে হাদীসে? বরং রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নারীদের সরাসরি মসজিদে আসতে নিষেধ করেছেন এমন কোনো হাদীস পৃথিবীতে পাওয়া যায়না। অপর এক হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) "إِنِّيْ لَأَقُوْمُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أُطَوِّلَ

[১] সহীহ বুখারী- হু. আ. মা. প্র., ৮৬৭।
[২] সহীহ বুখারী- হু. আ. মা. প্র., ১২০৩।
[৩] সহীহ মুসলিম- হা. এ., ৮৭৩।
[৪] সহীহ মুসলিম- হা. এ., ৮৭১।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ (رضي الله عنها) قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءُ حِيْنَ يَقْضِيْ تَسْلِيْمَهُ وَيَمْكُثُ هُوَ فِيْ مَقَامِهِ يَسِيْرًا قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ قَالَ نَرَى وَاللهُ أَعْلَمُ أَنَّ ذٰلِكَ كَانَ لِكَيْ يَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ.

উম্মু সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) যখন সালাম ফিরাতেন, তখন মহিলারা তাঁর সালাম শেষ করার পর উঠে যেতেন। নবী (ﷺ) দাঁড়ানোর পূর্বে স্বীয় স্থানে কিছুক্ষণ অবস্থান করতেন। রাবী যুহরী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমাদের মনে হয়, তা এজন্য যে, অবশ্য আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন, যাতে পুরুষদের যাবার পূর্বেই নারীরা চলে যেতে পারে।"[৩]

অর্থাৎ- রাবী যুহরী (রাহিমাহুল্লাহ)'র মতে নবী (ﷺ) এবং তার সাহাবায়ে কেরামের ফর্‌য সালাত পরে মসজিদে বসে থাকার উদ্দেশ্য এই হাদীসের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, তারা নারীদের বাসায় চলে যাওয়ার জন্য মসজিদে অপেক্ষা করতেন। উক্ত হাদীসটি ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) তার সহীহুল বুখারী'র "পুরুষদের পিছনে নারীদের সালাত" শিরোনামে ১০/১৬৪তম অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন। আরেক হাদীসে এসেছে,

أَنَّ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةَ، كَانَتْ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) أَنَّهُ قَالَ "إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلَا تَطَيَّبْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ".

সাকীফ গোত্রের যাইনাব আস্ সাকাফিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমাদের (মহিলাদের) কেউ যখন 'ইশার সালাতে শামিল হতে চায়, ঐ রাতে সে যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে।[৪]

অর্থাৎ- মহিলাদের মসজিদে গিয়ে সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সুগন্ধি ব্যবহার না করার শর্ত আরোপ করে দিয়েছেন এবং এই শর্তের আলোকেই বৈধতা দিয়েছেন। উক্ত হাদীসটিও ইমাম মুসলিম (রাহিমাহুল্লাহ) তার সহীহ মুসলিমের "অবাঞ্ছিত কিছু ঘটার সম্ভাবনা না থাকলে মহিলাদের মসজিদে যাওয়া কিন্তু সুগন্ধি মেখে তারা বের হবে না" শিরোনামে ৫৫৩তম অধ্যায়ে একাধারে কয়েকটি হাদীস নিয়ে এসেছেন। *[চলবে ইন্ শা-আল্লাহ]*

[৩] *সহীহ বুখারী- হু. আ. মা. প্র., ৮৭০।*
[৪] *সহীহ মুসলিম- হা. এ., ৮৮২, ৮৮৩, ৮৮৪।*

فِيْهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِيْ صَلَاتِيْ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ".

আবূ ক্বাতাদাহ্ আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, আমি সালাতে দাঁড়িয়ে তা দীর্ঘায়িত করব বলে ইচ্ছা করি, অতঃপর শিশুর কান্না শুনতে পেয়ে আমি সালাত সংক্ষিপ্ত করি এ আশংকায় যে, তার মা কষ্ট পাবে।[১]

অর্থাৎ- এই হাদীস থেকেও পাওয়া যাচ্ছে যে মহিলারা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পিছনে মসজিদে সালাত আদায় করতেন এবং তাদের সাথে শিশুরা থাকতো। শুধুমাত্র নারীদের ও শিশুদের কষ্টের কথা চিন্তা করে তিনি সালাতকে দীর্ঘ করেননি; বরং সালাত সংক্ষিপ্ত করেছেন। উক্ত হাদীসটিও ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) তার সহীহুল বুখারী'র "রাতে ও অন্ধকারে মহিলাগণের মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হওয়া" শিরোনামে ৩০তম অধ্যায়ে নিয়ে এসেছেন। হাদীসে আরো এসেছে,

قَالَ حَدَّثَتْنِيْ هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ (ﷺ) أَخْبَرَتْهَا أَنَّ النِّسَاءَ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ قُمْنَ وَثَبَتَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) وَمَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللهُ فَإِذَا قَامَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) قَامَ الرِّجَالُ.

হিন্দ বিনতু হারিস (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। নবী (ﷺ)-এর স্ত্রী সালামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে জানিয়েছেন, নারীরা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সময় ফর্‌য সালাতের সালাম ফিরানোর সাথে সাথে উঠে যেতেন এবং আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-ও তাঁর সঙ্গে সালাত আদায়কারী পুরুষগণ, আল্লাহ যতক্ষণ ইচ্ছা করেন অবস্থান করতেন। অতঃপর আল্লাহর রাসূল উঠলে পুরুষরাও উঠে যেতেন।[২]

অর্থাৎ- ফর্‌য সালাতের সালাম ফিরানোর সাথে সাথেই নারীরা উঠে চলে যেতেন এবং রাসূল (ﷺ)-ও তাঁর সঙ্গে সালাত আদায়কারী পুরুষগণ বসে থাকতেন। উক্ত হাদীসটি ইমাম বুখারী (রাহিমাহুল্লাহ) তার সহীহুল বুখারী'র "ইমামের দাঁড়ানো পর্যন্ত মানুষের অপেক্ষা" শিরোনামে ১০/১৬৩তম অধ্যায়ে একাধারে বেশকয়েকটি হাদীস নিয়ে এসেছেন। অপর এক হাদীসে এসেছে,

[১] *সহীহ বুখারী- হু. আ. মা. প্র., ৮৬৮।*
[২] *সহীহ বুখারী- হু. আ. মা. প্র., ৮৬৬।*

المعتقد الباطل / ভ্রান্ত মতবাদ

“হুসাইনী ব্রাহ্মণ” এক ব্যাতিক্রম সম্প্রদায়

আহমাদ বিন আব্দুস সালাম★

হুসাইনী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ভারতীয় উপমহাদেশের সামাজিক এবং ধর্মীয় ইতিহাসের এক অত্যন্ত বিরল ও ব্যাতিক্রম উদাহরণ। যেখানে উচ্চ বর্ণের হিন্দু এবং শিয়া ইসলাম একীভূত হয়েছে। যারা উচ্চ বর্ণের হিন্দু ব্রাহ্মণ হয়েও, তাদের বিশ্বাসে ধারন করেছে চতুর্থ খলিফা ‘আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র পুত্র হুসাইন কে। এই সম্প্রদায়ের আদি উৎপত্তি ধারাটি ছিল এমন; তারা গজনি, বলখ এবং বুখারা অঞ্চলগুলো হয়ে এবং কান্দাহার প্রবেশ করে সিন্ধু নদীর দিকে এগিয়ে যায়। অতঃপর সেখান থেকে তাঁরা সিন্ধু অতিক্রম করে পাঞ্জাবে প্রবেশ করে এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করে। এই সম্প্রদায়ের নামের মধ্যেই রয়েছে দু’টি আপাত-বিপরীত পরিচয়ের সমন্বয়– ‘হুসাইনী’ শব্দটি এসেছে ইসলামের মহান শহীদ ইমাম হুসেন ইবনু ‘আলীর নাম থেকে এবং ‘ব্রাহ্মণ’ শব্দটি সনাতন হিন্দু ধর্মের সর্বোচ্চ বর্ণগত শ্রেণিবিন্যাসকে নির্দেশ করে। এই সম্প্রদায়কে প্রায়শই একটি আন্তঃধর্মীয় সমন্বয়ের (Crossover creed) ফল হিসেবে দেখা হয়।

এই সম্প্রদায়ের সদস্যরা মূলত ভারতের পাঞ্জাব ও হরিয়ানা অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী মোহিয়াল ব্রাহ্মণদের একটি উপ-শাখা। বিশেষ করে মোহিয়ালদের সাতটি উপ-গোত্রের মধ্যে ‘দত্ত’ (Dutt/Datt) গোত্রের সদস্যরা এই হুসাইনী পরিচিতি বহন করেন। মোহিয়াল সম্প্রদায় হলো পাঞ্জাবি-ভাষী একটি গোষ্ঠী, যাদের সাতটি উপ-গোষ্ঠী রয়েছে: বাল্লী, ভীমওয়াল, ছিব্বর, দত্ত, লৌ, মোহন, এবং বৈদ্য। তাঁরা নিজেদেরকে এমন ব্রাহ্মণ হিসেবে দেখেন যারা বহু প্রাচীন কাল থেকেই পুরোহিতের কাজ প্রত্যাখ্যান করেছেন। এর বদলে তাঁরা সামরিক বা প্রশাসনিক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, যার কারণে তাঁরা ‘যোদ্ধা ব্রাহ্মণ’ বা ‘সামরিক ব্রাহ্মণ’ নামে পরিচিত। এই গোষ্ঠীর ঐতিহাসিক পদবিগুলোর মধ্যে রয়েছে বক্সী, চৌধুরী, রায়জাদা এবং মেহতা। দত্ত বংশের সদস্যরা নিজেদেরকে মহাকাব্যিক চরিত্র দ্রোণাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামার বংশধর বলে মনে করেন। এই সম্প্রদায় হিন্দু ধর্মাবলম্বী হলেও, তাঁরা ঐতিহ্যগতভাবে অ-ভারতীয় (non-Indic) কিছু ঐতিহ্য গ্রহণ করেছেন, যা তাঁদেরকে হুসাইনী ভক্তির দিকে পরিচালিত করে।

হুসাইনী ব্রাহ্মণদের দত্ত উপ-গোষ্ঠীর সদস্যরা মূলত পাঞ্জাবের শিয়ালকোট জেলার দিনা নগর-এ বসতি স্থাপন করেন। কিছু পরিবার অভ্যন্তরীণভাবে স্থানান্তরিত হয়ে সুদূর রাজস্থানের পুষ্করে বসতি স্থাপন করে। পুষ্কর হিন্দু তীর্থস্থান হলেও এটি সুফি ঐতিহ্যের কেন্দ্র আজমিরের সন্নিকটে অবস্থিত, যেখানে বিখ্যাত সুফি পীর মঈনুদ্দিন চিশতি তাঁর শেষ দিনগুলো কাটিয়েছিলেন। এই বসতি স্থাপনের তথ্য ১৮৮৮ সালে মির্জা আজম বেগের লেখা বান্দোবস্ত রিপোর্ট অফ গুজরাট-এর ৪২২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে , যা তাঁদের মৌখিক ঐতিহ্যকে কিছুটা ঐতিহাসিক ভিত্তি দেয়। হুসাইনী ব্রাহ্মণদের ইতিহাস মূলত মৌখিক ঐতিহ্য (Oral history) এবং লোকগাথার ওপর নির্ভরশীল। এই ঐতিহ্য, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে মুখে মুখে সঞ্চালিত হয়েছে। কারবালার ঘটনার প্রামাণিক ইসলামিক ইতিহাসে– যেমন আল-তাবারি বা ইবনু কাসিরের মতো প্রাথমিক ইতিহাসবিদদের লেখায়– ‘রাহাব সিধ দত্ত’ বা কারবালায় কোনো ভারতীয় যোদ্ধার অংশগ্রহণের কোনো স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফলে তাঁদের ইতিহাস ঐতিহ্যগত ইসলামিক এবং হিন্দু উভয় প্রমাণের কাঠিন্যে দুর্বল। তবে, পাঞ্জাবি সাহিত্য, লোকগাথা এবং মির্জা আজম বেগের মতো স্থানীয় ঐতিহাসিকদের নথি এই আখ্যানকে ঐতিহাসিক ভিত্তি প্রদান করে। গবেষক ননিকা দত্ত (Nonica Datta), যিনি তাঁর পারিবারিক ইতিহাসের মাধ্যমে এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত, তিনি অমৃতসরের মহররম পালনে হুসাইনী ব্রাহ্মণদের ‘বিস্মৃত ইতিহাস’ (Forgotten History) নিয়ে গবেষণা করেছেন।

৬৮০ খ্রিস্টাব্দে কারবালার যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার সময়, প্রায় ১,৪০০ ব্রাহ্মণ পরিবার পশ্চিম এশিয়া, বিশেষত আধুনিক ইরাকের বাগদাদ এবং কুফার আশেপাশে বসবাস করতেন। পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশ, ভারতের পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান, কাশ্মীর, দিল্লি ও লখনৌর নানা প্রান্তে

★ *শিক্ষার্থী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।*

এখনো বেশ কয়েক হাজার হুসাইনি ব্রাহ্মণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করেন। কোনো কোনো গবেষক জানাচ্ছেন, আরব উপদ্বীপেও বেশ কিছু হুসাইনি ব্রাহ্মণ আছেন।

এই ব্রাহ্মণরা সম্ভবত সামরিক বা প্রশাসনিক পরিষেবার জন্য সেখানে বসতি স্থাপন করেছিলেন, যা মোহিয়ালদের সামরিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তাঁরা যে অঞ্চলে থাকতেন, তার নাম ছিল 'দাইর-আল-হিন্দিয়া' (Dair-al-Hindiya), যার অর্থ "দ্য ইন্ডিয়ান কোয়ার্টার" বা "ভারতীয়দের বাসস্থান"। এই স্থানটির নাম এখনও আল-হিন্দিয়া নামে বিদ্যমান, যা এই লোককথাকে কিছুটা ভৌগোলিক বিশ্বাসযোগ্যতা দেয়।

হুসাইনী ব্রাহ্মণদের লোকগাথার কেন্দ্রে রয়েছেন মোহিয়াল ব্রাহ্মণদের দত্ত বংশের নেতা "রাহাব সিধ দত্ত"। কিছু বর্ণনায় তাঁকে রাহিব সিধ বা সিধ বিয়োগ দত্ত নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। কারবালায় পৌঁছে যখন ইমাম হোসেন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সাহায্য চাইলেন, তখন রাহাব দত্ত তাঁর সাত পুত্রকে নিয়ে কারবালার উদ্দেশ্যে রওনা হন বলে প্রচলিত। ব্রিটিশ লেখক টি পি রাসেল স্ট্রেসি তাঁর 'দ্য হিস্ট্রি অফ মোহিয়ালস' (১৯১১) বইতে পুত্রদের নাম উল্লেখ করেছেন সাহুস রায়, হরজাস রায়, শের খান, রাম সিং, রায় পুন, ধোরো এবং পুরো। তাঁদের কারবালায় অংশগ্রহণের বিষয়ে দু'টি প্রধান মৌখিক ইতিহাস প্রচলিত:

১. যুদ্ধে শাহাদত: এক বিবরণে বলা হয়েছে, রাহাব দত্ত তাঁর সাত পুত্রসহ আশুরার দিন ইমাম হুসেনের পক্ষে কুফা আক্রমণের সময় বা কারবালার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং শাহাদত বরণ করেন।

২. পবিত্র মস্তক রক্ষা: অন্য এক বহুল প্রচলিত কিংবদন্তি অনুযায়ী, রাহাব দত্ত যুদ্ধের ঠিক পরে কারবালায় পৌঁছান। তিনি ইমাম হুসেনের শাহাদতের মর্মান্তিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন। মৌখিক বর্ণিত ইতিহাসে বলা হয়, এই আত্মত্যাগ ও শোক দেখে ইমাম হুসেনের বোন জয়নাব (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁদেরকে 'হুসাইনী ব্রাহ্মণ' উপাধি দেন। এই ইতিহাসের ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব থাকা সত্ত্বেও, এই গল্পটি এই সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের পরিচয় হিসেবে দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে। এটি প্রমাণ করে যে এই সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ক্ষেত্রে প্রথাগত 'ইতিহাস' অপেক্ষা 'স্মৃতি' (Memory) এবং 'বিশ্বাস' (Faith) অনেক বেশি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।

এই ইতিহাস ১৯২৪ সালে প্রকাশিত মুন্সি প্রেমচাঁদের ঐতিহাসিক নাটক 'কারবালা'-তেও স্থান পেয়েছে, যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে ইমাম হুসেনের পক্ষে লড়াই করা হিন্দুরা অশ্বত্থামার বংশধর।

এছাড়া, আত্মত্যাগের এই ঐতিহ্যটি একটি দৈহিক প্রতীকায়ন-এর মাধ্যমে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, দত্ত ব্রাহ্মণদের বংশধরেরা আজও তাঁদের গলায় বা ঘাড়ের পাশে ছুরির কাটার মতো একটি দাগ বহন করেন, যা কারবালায় তাঁদের পূর্বপুরুষদের আত্মত্যাগের প্রতীক। একটি মৌখিক ঐতিহ্যকে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করার এই ইতিহাস পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ঘটনা। ৭০ বছর বয়সী K K Bali বলেন; "আমার বাবা আমাকে আমাদের গর্বিত ইতিহাস সম্পর্কে বলেছিলেন এবং আমার দাদীও তাই বলেছিলেন। শৈশব থেকেই যখন আমরা শিয়া সম্প্রদায়ের সদস্যদের সাথে শাহনাজফ ইমামবাড়ায় মজলিসে যোগ দিতাম, তখন থেকেই আমাদের মধ্যে এটি একটি মূল্যবোধ গেঁথে ছিল,আমাদের কাছে এটি সেই জীবন যা আমরা ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে যাপন করে আসছি। আমার বাড়ির সামনের এই রাস্তা দিয়েই প্রতি বছর মহররমের জলুস যায়। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত আমি নিজেও সেই জলুসে অংশ নিয়েছি, এখন আর বয়সের জন্য পারি না। আমরা শিয়াদের সঙ্গে শহরের শাহনাজাফ ইমামবড়ার মজলিসেও যেতাম, আবার বাড়িতে হিন্দুদের নবরাত্রি অনুষ্ঠানও পালন করতাম।"

হুসাইনি ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে রাধিকা বলছিলেন, "আগে আমাদের অনেক আত্মীয়স্বজনকে দেখতাম যারা রমাযান মাসে বেশ কয়েকটা রোজা রাখতেন, আবার মহররম মাসে আশুরাও পালন করতেন। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে এমনও অনেকে ছিলেন যারা মাঝেসাঝে মসজিদেও যেতেন, জুম্মার সালাতে পর্যন্ত অংশ নিতেন। আমরা দাদি নানিদের কাছে খুব ছোট্টবেলা থেকে কারবালা যুদ্ধের গল্প শুনে আসছি। আমাদের পূর্বপুরুষ তার শ্রদ্ধার নায়কের জন্য একবারও না ভেবে নিজের সাত ছেলের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন, এটা আসলে হুসাইনি ব্রাহ্মণদের জন্য খুব গোপন গর্বের জায়গা।"

ঐশ্বর্য ঝিংরান বলেন, 'আমরা হিন্দু ব্রাহ্মণ হতে পারি, কিন্তু খুব ব্যতিক্রমী ব্রাহ্মণ-কারণ আমরা ইমাম হোসাইনের ভক্ত!'

ইন্দো-ইসলামিক মিশ্রণঃ হুসাইনী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ভারতীয় ইন্দো-ইসলামিক ঐতিহ্যের (Inclusive Indo-Islamic tradition) উদাহরণ। তাঁরা এমন এক মিশ্র জীবনধারা (Mixed blend) পালন করেন যেখানে সনাতন বৈদিক আচার এবং শিয়াদের ঐতিহ্য একীভূত হয়েছে। এই সমন্বয়কে মোগল রাজপুত্র ও সুফি দার্শনিক দারা শিকোহের 'মাজমা-উল-বাহরাইন' (দুই সমুদ্রের মিলন) ধারণার সঙ্গে তুলনা করা যায়।

তাঁদের পরিচয়ের এই দ্বৈততা সম্পর্কে প্রচলিত প্রবাদটিই সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় কারবালার যুদ্ধে রিহাব সিং দত্ত ও তার পুত্রদের বীরত্বকে স্মরণ করে প্রাচীন হিন্দুস্তানি কবি লিখে গেছেন– **"वह दत्त सुल्तान, हिन्दू का धर्म, मुसलमान का ईमान, आधा हिन्दू आधा मुसलमान।"** (Wah Datt Sultan, Hindu ka dharm, Musalman ka iman, Adha Hindu Adha Musalman) "তিনি দত্ত সুলতান, হিন্দুর ধর্ম, মুসলমানের ঈমান, অর্ধেক হিন্দু, অর্ধেক মুসলমান।"

এই প্রবাদটি নির্দেশ করে যে, তাঁরা হিন্দু ধর্মাবলম্বী হিসেবে নিজেদের ধর্ম পালন করেন, কিন্তু ইমাম হুসাইন (আঃ)'র প্রতি নিঃশর্ত ভক্তিকে তাঁদের বিশ্বাসের (ঈমান) অপরিহার্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

হুসাইনী ব্রাহ্মণদের জীবনযাত্রায় ধর্মীয় সংমিশ্রণ–

হিন্দু রীতিনীতিঃ তাঁরা ঐতিহ্যবাহী ব্রাহ্মণদের মতোই যজ্ঞোপবীত (পৈতা) পরিধান করেন এবং কপালে তিলক লাগান। এটি তাঁদের ব্রাহ্মণ্য পরিচয় এবং সনাতন বৈদিক কাঠামোর প্রতি আনুগত্যকে বজায় রাখে।

শিয়া ভক্তি ও মুহররমঃ এই সম্প্রদায়ের প্রতি বছর মহররম পালন করেন এবং তাজিয়া মিসিল করে মাতম করে। তাঁরা তাঁদের পূজা বা ধর্মীয় স্থানে হিন্দু দেব-দেবীর ছবি ও মূর্তির পাশাপাশি আলম (ইমাম হুসাইনের প্রতীকের পতাকা) স্থাপন করেন। অমৃতসরের মতো জায়গায় তাজিয়া মিছিলে তাঁদের ঘনিষ্ঠ অংশগ্রহণ দেখা যায় প্রতি বছর।

সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণঃ উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে হিন্দুরা মহররমের মিছিলে অংশগ্রহণ করে। এমনও বিশ্বাস রয়েছে যে, মহররমের মিছিলে চলমান আলম-এর নিচ দিয়ে নিঃসন্তান মহিলারা গড়িয়ে গেলে তাঁরা সন্তান লাভের আশীর্বাদ পান।

সামাজিক রীতিনীতিঃ হুসাইনী ব্রাহ্মণদের একটি অত্যন্ত ব্যতিক্রমী প্রথা হলো, তাঁরা শুধুমাত্র মুসলমানদের কাছ থেকে আলমস (ভিক্ষা বা দান) গ্রহণ করেন, কিন্তু হিন্দুদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করেন না।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বঃ আধুনিক সমাজে হুসাইনী ব্রাহ্মণরা সামরিক বা প্রশাসনিক ক্ষেত্র থেকে সরে এসে শিল্প, সাহিত্য এবং রাজনীতিতে সফলতা লাভ করেছেন, যা তাঁদের ঐতিহ্যের একটি আধুনিক রূপান্তর নির্দেশ করে।

চলচ্চিত্র ও রাজনীতিঃ ভারতের বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা এবং রাজনীতিবিদ সুনীল দত্ত এবং তাঁর পুত্র সঞ্জয় দত্ত এই সম্প্রদায়ের সুপরিচিত প্রতিনিধি। সুনীল দত্ত প্রকাশ্যে তাঁর হুসাইনী পরিচিতির কথা স্বীকার করেছেন। সুনীল দত্তের মতো ব্যক্তিত্বরা তাঁদের 'অর্ধেক হিন্দু, অর্ধেক মুসলমান' পরিচয়কে রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করতে সক্ষম হন।

সাহিত্য ও শিক্ষাঃ উর্দু লেখক কাশ্মীরি লাল জাকির, সবির দত্ত এবং নন্দ কিশোর বিক্রমও হুসাইনী ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত। শিক্ষাবিদ ভি. এন. দত্ত এবং সাংবাদিক যমনাদাস আখতারও এই সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে পরিচিত। হুসাইনি ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা সুনীতা ঝিংরান, প্রবীণ এই ধ্রুপদী সঙ্গীতশিল্পী তার ঠুমরি, খেয়াল, দাদরা ও গজলের জন্য সুপরিচিত-গানের জন্য ভারতের জাতীয় স্তরেও বহু পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

হুসাইনী ব্রাহ্মণদের জটিল ও মিশ্র সংস্কৃতি তাঁদের জন্য পরিচয়ের সংকট এবং সামাজিক সন্দেহ সৃষ্টি করেছে। মূলধারার হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজই প্রায়শই তাঁদের অস্তিত্ব ও দাবি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে। সম্প্রদায়ের সদস্যরা নিজেরাই অনুভব করেন যে বৃহত্তর সমাজে তাঁদের ইতিহাস সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি রয়েছে।

এই সন্দেহের প্রধান কারণ হলো ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব। অন্যদিকে, কিছু গবেষক এই তত্ত্বও উত্থাপন করেছেন যে হুসাইনী ব্রাহ্মণরা হয়তো ছিলেন শিয়া মুসলিম, যারা হিন্দুদের মধ্যে 'তাকিয়াহ' (বিশ্বাস গোপন রাখা) করার কারণে পরবর্তীতে নিজেদের মুসলিম শিকড় ভুলে গিয়ে হিন্দু জনসংখ্যার সঙ্গে মিশে গেছেন।

সূত্রঃ **১.** *Hussaini Brahmins: A crossover creed। Lucknow News- The Times of India, Oct 16, 2015।* **২.** *Hussaini Brahmins- Half Hindu and Half Muslim- THE INDIA OBSERVER, August 10, 2022।* **৩.** *ইমাম হোসাইনের অনুগামী যে হিন্দু ব্রাহ্মণরা মহররম পালন করে থাকেন; বিবিসি নিউজ বাংলা, দিল্লি, ৪ জুলাই-২০২৫।* **৪.** *View source for Hussaini Brahmin/Dutt- Indpaedia।* **৫.** *Mohyal Community- IndiaNetzone।* **৬.** *The Hussaini Brahmins in India। Imam Reza।*

أخبار الجمعية / জমঈয়ত সংবাদ

রিয়াদে উপমহাদেশের শীর্ষ সালাফী নেতৃবৃন্দের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত

'উমরাহ্ পালন উপলক্ষ্যে সফররত পাকিস্তান কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলে হাদীস, ভারতীয় কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলে হাদীস এবং বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের এক গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় সভা গত ২৯ জুন-২০২৬ সোমবার বাদ জোহর সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে অনুষ্ঠিত হয়।

পাকিস্তান কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলে হাদীসের সৌদি আরব প্রবাসী শাখার আমীর ও বৈদেশিক বিষয়ক চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুল মালিক মুজাহিদের নিমন্ত্রণে আয়োজিত এই মর্যাদাপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলে হাদীসের আমীর ও বিশ্বব্যাপী সালাফি দাওয়াতের বরেণ্য নেতা পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সিনেটর ড. হাফিজ আব্দুল করীম, ভারতের কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলে হাদীসের আমীর মাওলানা আসগর আলী সালাফী, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফী, সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম, ফাতাওয়া ও গবেষণা বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ড. মুহাম্মদ ইবরাহিম মাদানী, বিদেশ ও প্রবাস বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ ড. হাফেয সোহাইল আহমাদ মাদানী, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও প্রবাসী জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস (সৌদি আরব পূর্বাঞ্চল)-এর সহসভাপতি শাইখ আব্দুর রব আফফান মাদানী, পাকিস্তান কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলে হাদীসের রিয়াদ শাখার সেক্রেটারি ইঞ্জিনিয়ার ড. হাফেয ইমরান, দারুস সালাম প্রকাশনীর হাফিজ আব্দুল গফ্ফার মুজাহিদ প্রমুখ।

মুসলিম বিশ্বে চলমান দ্বীনি ও দাওয়াতি ক্ষেত্রে উদ্ভূত চ্যালেঞ্জসমূহ, কুরআন ও সুন্নাহর দাওয়াতের প্রসার, এবং সালাফে সালেহীনের মধ্যপন্থা ও ভারসাম্যপূর্ণ আদর্শ প্রচারের ওপর বৈঠকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়।

সভায় অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে একমত হন যে, মুসলিম বিশ্বের দ্বীনি ও দাওয়াতি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা আরো সুদৃঢ় করা প্রয়োজন। পাশাপাশি ইসলামের দাওয়াতের প্রসারে যৌথ প্রচেষ্টাকে আরো বিস্তৃত করা এবং ভ্রাতৃত্ব, ঐক্য ও মধ্যপন্থার বার্তা সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে পারস্পরিক সহযোগিতাকে আরো কার্যকর করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

আলোচনার এক পর্যায়ে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক সালাফী আগামী ৫-৬ নভেম্বর ২০২৬ বাংলাদেশে অনুষ্ঠেয় আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলনে অংশগ্রহনের জন্য ভারত এবং পাকিস্তান জমঈয়তের নেতৃবৃন্দকে আনুষ্ঠানিক দাওয়াত প্রদান করেন। উল্লেখ্য, আগের দিন ২৮ জুন ২০২৬ রবিবারেও পাকিস্তান কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলে হাদীসের বিদেশ বিষয়ক চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুল মালিক মুজাহিদ ভারত এবং বাংলাদেশের জমঈয়ত নেতৃবৃন্দের সম্মানে মধ্যাহ্ন ভোজ এবং মতবিনিময় সভার আয়োজন করেন।

বৈঠকের শেষে সকল নেতৃবৃন্দ সৌদি সরকার ও সৌদি নেতৃত্বের প্রতি হারামাইন শরীফাইন এবং হাজীদের সেবায় তাদের অনুকরণীয় অবদানের জন্য প্রশংসা ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সালাফী আলেমদেরকে নিমন্ত্রণ করে মতবিনিময় করার সুযোগ করে দেয়ার জন্য দারুস সালাম প্রকাশনীর কর্ণধার পাকিস্তান কেন্দ্রীয় জমঈয়তে আহলে হাদীসের সৌদি আরব প্রবাসী শাখার আমীর ও বিদেশ বিষয়ক চেয়ারম্যান মাওলানা আব্দুল মালিক মুজাহিদকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়।

ঢাকা দক্ষিণ জমঈয়তের মহিলাদের সঠিক দ্বীন শিক্ষা কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের উদ্যোগে গত শনিবার (৪ জুলাই) রাজধানীর ঐতিহাসিক বংশাল বড় জামে মসজিদে "মহিলাদের সঠিক দ্বীন শিক্ষা কর্মশালা-২০২৬" অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রায় চারশত মা-বোনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে দিনব্যাপী এ কর্মশালা সুশৃঙ্খল ও প্রাণবন্ত পরিবেশে সম্পন্ন হয়।

আয়োজক সূত্র জানায়, নারীদের মাঝে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহভিত্তিক বিশুদ্ধ দ্বীন শিক্ষা, সঠিক 'আক্বীদাহ্, ইবাদত, আদর্শ পারিবারিক জীবন, উত্তম চরিত্র গঠন, সন্তান প্রতিপালন এবং একজন মুসলিম নারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ছিল কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য।

পবিত্র কুরআনুল কারীম থেকে অর্থসহ তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। অর্থসহ তেলাওয়াত করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাসাজিদ বিষয়ক সম্পাদক শাইখ ড. রফিকুল ইসলাম মাদানী। পরে দারসুল হাদীস পেশ করেন মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়্যার উস্তাযুল ফিকহ শাইখ মুফতি মো. আব্দুর রউফ মাদানী।

কর্মশালার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি অধ্যাপক শাইখ ড. আব্দুল্লাহ ফারুক। স্বাগত বক্তব্য দেন কর্মশালার সদস্য সচিব শাইখ ড. আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও আলোচনা উপস্থাপন করেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাধারণ সম্পাদক শাইখ মুহাম্মদ এহসান উল্লাহ, কবি নজরুল সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক শাইখ ড. হেদায়েত উল্লাহ, মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়্যার উচ্চতর গবেষণা বিভাগের প্রধান শাইখ ড. হারুনুর রশীদ ত্রিশালী এবং বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী। বক্তারা যথাক্রমে মহিলাদের সঠিক দ্বীন শিক্ষার গুরুত্ব, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব, ইসলামে নারীর অধিকার ও মর্যাদা এবং আদর্শ পরিবার গঠনে নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় অধিবেশনে অনুষ্ঠিত প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণকারী মা-বোনরা তাঁদের বিভিন্ন দ্বীনি, পারিবারিক ও সামাজিক বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবিয়্যার মুদীর ও শাইখুল হাদীস শাইখ মোস্তফা বিন বাহরুদ্দীন আস-সালাফী কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে নারীদের জন্য প্রকাশিত "আল-মিসবাহ লিন নিসা" ম্যাগাজিনের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শাইখ ড. মুহাম্মদ ইবরাহিম বিন আব্দুল হালিম মাদানী ও শাইখ ড. আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম। প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন সংগঠনের সহ-সভাপতি ও বংশাল বড় জামে মসজিদের মুতাওয়াল্লী আলহাজ্জ আওলাদ হোসেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও ঢাকা মহানগর দক্ষিণ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম জাহাঙ্গীর সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে নোটবুক, কলম, ডেলিগেট কার্ড, পরিবেশবান্ধব ব্যাগ, "আল-মিসবাহ লিন নিসা" ম্যাগাজিন, "আকীদা ও তাওহীদে ১০০০ প্রশ্নোত্তর", "নবুয়তী যুগে ইসলাম প্রচারে নারীদের অবদান", সাপ্তাহিক আরাফাত এবং মাসিক তর্জুমানুল হাদীস প্রদান করা হয়। এছাড়া বিকালের নাস্তা ও রাতের খাবারের ব্যবস্থা ছিল।

অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন শাইখ শামসুল হক শিবলী, শাইখ ড. আহসানুল্লাহ বিন সানাউল্লাহ এবং শাইখ ইসহাক বিন এরশাদ মাদানী। শেষে কর্মশালার সফল বাস্তবায়নে সহযোগিতাকারী সকল বক্তা, স্বেচ্ছাসেবিকা, দায়িত্বশীল, দাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় এবং দেশ, জাতি ও উম্মাহর কল্যাণ কামনা করে প্রোগ্রামের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

খুলনা বিভাগীয় জমঈয়ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি ও দাওয়াতী কার্যক্রম সম্প্রসারণে দৃঢ় অঙ্গীকার। **যশোর, ২০ জুন:** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের খুলনা বিভাগীয় সম্মেলন গত ২০ জুন, শনিবার যশোর জেলার ঐতিহ্যবাহী লেবুতলা আহলে হাদীস জামে মসজিদে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে খুলনা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত সকল জেলার সভাপতি, সেক্রেটারি এবং বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল নেতৃবৃন্দ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও খুলনা বিভাগীয় কোঅর্ডিনেটর অধ্যাপক আহমদ আলীর সভাপতিত্বে সকাল ১০টায় সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সহ-সভাপতি, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাস'ঊদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন সংগঠনের সহ-সভাপতি উপাধ্যক্ষ শাইখ ওবায়দুল্লাহ গযনফর ও শাইখ গোলাম কিবরিয়া নূরী, যুগ্ম সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন, সাংগঠনিক সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মাদ রেজাউল ইসলাম, প্রচার ও জনসংযোগ বিষয়ক সেক্রেটারি মোহাম্মদ গোলাম রহমান এবং কেন্দ্রীয় শুব্বানের সাধারণ সম্পাদক শাইখ তানযীল আহমদ।

এছাড়াও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সাবেক উপ-পরিচালক অধ্যাপক ইমদাদুল হক, লেবুতলা দারুস সুন্নাহ মডেল মাদ্‌রাসার সেক্রেটারি ও স্থানীয় শাখা সভাপতি মোহাম্মদ ফরিদুল ইসলাম মধুসহ এলাকার বিশিষ্ট আলেম, শিক্ষাবিদ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে খুলনা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি জেলার প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ জেলার সাংগঠনিক অগ্রগতি, দাওয়াতী কার্যক্রম, বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। জেলা জমঈয়তের

পক্ষে রিপোর্ট পেশ ও পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন যশোর জেলা সভাপতি অধ্যাপক আহমদ আলী, খুলনা জেলা সভাপতি মাওলানা জুলফিকার আলী, ঝিনাইদহ জেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল জলিল খান, কুষ্টিয়া জেলা সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শহীদুল ইসলাম, বাগেরহাট জেলা সহ-সভাপতি মুহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, সাতক্ষীরা জেলা সেক্রেটারি শাইখ রবিউল ইসলাম প্রমুখ। এ সময় নেতৃবৃন্দ সাংগঠনিক সম্প্রসারণ, সদস্য সংগ্রহ অভিযান জোরদার, যুবসমাজকে ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও সম্পৃক্তকরণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উন্নয়ন এবং তাওহীদ ও সুন্নাহভিত্তিক দাওয়াহকে তৃণমূল পর্যায়ে আরো বিস্তৃত করার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

বক্তারা বলেন, ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, সহীহ 'আক্বীদাহ্ ও সুন্নাহর বিশুদ্ধ শিক্ষা প্রচার এবং সমাজ সংস্কারের মহান লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসকে আরো সুসংগঠিত, কার্যকর ও জনমুখী ভূমিকা পালন করতে হবে। তারা পারস্পরিক ঐক্য, আন্তরিকতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রেখে বিভাগের প্রতিটি জেলায় কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও ফলপ্রসূ করার আহ্বান জানান। সম্মেলনের সমাপনী পর্বে উপস্থিত দায়িত্বশীল ও কর্মীগণ দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে, সকল প্রতিবন্ধকতা ও অপতৎপরতা মোকাবিলা করে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের দাওয়াতী, শিক্ষা ও সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী, সুদৃঢ় ও ব্যাপক পরিসরে সম্প্রসারিত করা হবে। একই সঙ্গে বিভাগব্যাপী সংগঠনের সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন বাস্তবমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

অনুষ্ঠান বাস্তবায়নে নিরবচ্ছিন্ন দায়িত্ব পালন করেন যশোর জেলা জমঈয়তের সহ-সভাপতি শাইখ মুহম্মদ আব্দুর রশীদ, সেক্রেটারি মোহাম্মদ মোরশেদ আলমসহ স্থানীয় নেতাকর্মীবৃন্দ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন যশোর জেলা জমঈয়তের সহকারী সেক্রেটারি অধ্যাপক তৌহিদুল ইসলাম।

পরিশেষে দেশ, জাতি ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করে সম্মেলনের সফল সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

রাজশাহী মহানগর জমঈয়তের সাংগঠনিক কার্যক্রমে গতি সঞ্চারিত

পৃথক ৬টি এলাকায় সুধী সমাবেশ ও শাখা কমিটি গঠন:

রাজশাহী মহানগর প্রতিনিধি: বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের রাজশাহী মহানগর শাখার উদ্যোগে মহানগরীর বিভিন্ন এলাকায় ধারাবাহিকভাবে সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসকল সমাবেশে সংগঠনের দাওয়াতি কার্যক্রম সম্প্রসারণ, কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং সাংগঠনিক কার্যক্রমকে তৃণমূল পর্যায়ে শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। সমাবেশগুলোতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ, আলেম-উলামা, শিক্ষাবিদ, সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং বিপুলসংখ্যক শুভানুধ্যায়ী অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি সমাবেশ শেষে সর্বসম্মতিক্রমে সংশ্লিষ্ট এলাকার শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

১. নওদাপাড়ায় সুধী সমাবেশ ও আহ্বায়ক কমিটি গঠন: গত ১৮ জুন বাদ মাগরিব রাজশাহী মহানগরীর মধ্য নওদাপাড়া ছোট আহলে হাদীস জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ। প্রধান আলোচক ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা গোলাম কিবরিয়া নূরী।

মাওলানা মো. ইমরান আলীর সভাপতিত্বে এবং মাওলানা মো. ইব্রাহিম খলিলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে আরো বক্তব্য দেন মাওলানা মো. আব্দুল আহাদ, মাওলানা মো. ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ ও মাওলানা মো. আব্দুল খালেক। সমাবেশে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, আলেম-উলামা, শিক্ষাবিদ ও শুভানুধ্যায়ীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে প্রাণবন্ত পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

সমাপনী পর্বে সর্বসম্মতিক্রমে নওদাপাড়া শাখার আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়। এতে মাওলানা মো. ইব্রাহিম খলিল আহ্বায়ক, মাওলানা মো. ইমরান আলী যুগ্ম আহ্বায়ক এবং মাওলানা মো. ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ সদস্য সচিব মনোনীত হন।

২. হেতেমখাঁয় সুধী সমাবেশ ও শাখা কমিটি গঠন: একই দিন ১৮ জুন বাদ মাগরিব হেতেমখাঁ আহলে হাদীস জামে মসজিদে আরেকটি সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ এবং প্রধান আলোচক ছিলেন মাওলানা গোলাম কিবরিয়া নূরী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুগ্ম সম্পাদক শাইখ মুহাম্মদ আব্দুল মাতীন ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সম্পাদক প্রফেসর ড. মতিউর রহমান।

প্রফেসর মো. নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং মাওলানা মো. আমিনুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দেন বিশিষ্ট দায়ী শাইখ মো. আসাদুজ্জামান মাদানী, রাজশাহী জেলা শাখার সহকারী সম্পাদক ড. আহমাদুল্লাহসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

সমাবেশ শেষে সর্বসম্মতিক্রমে হেতেমখাঁ শাখা কমিটি গঠন করা হয়। এতে প্রফেসর মো. নূরুল ইসলাম সভাপতি, মো. আব্দুর রাজ্জাক ও মো. শফিকুল ইসলাম সহ-সভাপতি এবং মাওলানা মো. আমিনুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

৩. খোজাপুরে নতুন শাখা কমিটি ও সুধী সমাবেশ: গত ২২ জুন বাদ মাগরিব খোজাপুর মোল্লাপাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন মাওলানা গোলাম কিবরিয়া নূরী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. মতিউর রহমান।

মো. আব্দুস সাত্তার মোল্লার সভাপতিত্বে ও মো. ফরহাদ মোল্লার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে আরো বক্তব্য রাখেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আবু হেনা মোস্তফা কামাল, হাফেয রমজান আলীসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

সমাবেশ শেষে সর্বসম্মতিক্রমে খোজাপুর শাখা কমিটি গঠন করা হয়। এতে মো. আব্দুস সাত্তার মোল্লা সভাপতি, মো. আবুবকর মোল্লা ও মো. রবিউল ইসলাম মোল্লা সহ-সভাপতি এবং মো. আবু হানিফ মোল্লা সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন।

৪. বিনোদপুরে সাংগঠনিক কার্যক্রমের সম্প্রসারণ: গত ২৪ জুন বাদ মাগরিব বিনোদপুরস্থ আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক আহলে হাদীস জামে মসজিদে সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মাওলানা গোলাম কিবরিয়া নূরী এবং প্রধান আলোচক ছিলেন প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা সম্পাদক ও রাজশাহী জেলা সভাপতি প্রফেসর ড. মতিউর রহমান।

হাফেয মো. রমজান আলীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী জেলা শুব্বানের সেক্রেটারি শহীদুল্লাহ আল ফারুক ও মো. আব্দুল ওয়াদুদ।

সমাবেশ শেষে সর্বসম্মতিক্রমে বিনোদপুর শাখার কমিটি গঠন করা হয়। এতে আবু হেনা মোস্তফা কামাল সভাপতি, মো. মনিমুল হক ও প্রফেসর ড. আশরাফ উজ্জামান সহ-সভাপতি এবং হাফেজ মো. রমজান আলী সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন।

৫. শিরোইল মহলদারপাড়ায় দাওয়াতি কার্যক্রম: গত ২৫ জুন বাদ মাগরিব শিরোইল মহলদারপাড়া আহলে হাদীস জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ। প্রধান আলোচক ছিলেন মাওলানা গোলাম কিবরিয়া নূরী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. মতিউর রহমান। এছাড়া আলোচক হিসেবে বক্তব্য দেন শুব্বানের জেলা সাধারণ সম্পাদক শহীদুল্লাহ আল ফারুক ও মাওলানা মো. আব্দুল লতিফ মাহমুদ।

বক্তারা কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জীবনব্যবস্থা, আহলে হাদীসের দাওয়াতের গুরুত্ব এবং সালফে সালিহীনের আদর্শ অনুসরণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সমাবেশ শেষে সর্বসম্মতিক্রমে শিরোইল মহলদারপাড়া শাখা কমিটি গঠন করা হয়। এতে মো. আকরাম হোসেন সভাপতি, মো. আবু তালিম শামীম ও মো. এনামুল হক সহ-সভাপতি এবং মো. দিলশাদ হোসেন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

৬. শ্যামপুরে সুধী সমাবেশের মাধ্যমে নতুন শাখা কমিটি: গত ২৮ জুন বাদ মাগরিব শ্যামপুরের মৌলভীপাড়া জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ। প্রধান আলোচক ছিলেন মাওলানা গোলাম কিবরিয়া নূরী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রফেসর ড. মতিউর রহমান।

সমাবেশে আরো বক্তব্য দেন মাওলানা রফিকুল ইসলাম, হাফেজ রমজান আলী, মাওলানা আব্দুল ওয়াদুদ এবং মাওলানা আমিনুল ইসলাম। বিপুলসংখ্যক আলেম-উলামা, শিক্ষাবিদ, সুধীজন ও শুভানুধ্যায়ীর উপস্থিতিতে সমাবেশটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়।

পরে সর্বসম্মতিক্রমে শ্যামপুর শাখা কমিটি গঠন করা হয়। এতে মো. জিল্লুর রহমান সভাপতি, মো. আব্দুল্লাহ ও মো. মোশাররফ হোসেন মুক্তার সহ-সভাপতি এবং মো. আব্দুল লতিফ সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন।

সমাপনী বক্তব্যে নেতৃবৃন্দ বলেন, রাজশাহী মহানগরের প্রতিটি এলাকায় সংগঠনের সাংগঠনিক ভিত্তি আরো সুদৃঢ় করতে ধারাবাহিকভাবে এ ধরনের সুধী সমাবেশ, দাওয়াতি কার্যক্রম ও শাখা কমিটি গঠনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

কালনী নোয়াগাঁও এলাকা জমঈয়ত ও শুব্বানের ১৪তম মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর অন্তর্গত কালনী নোয়াগাঁও এলাকা জমঈয়ত ও শুব্বানের ১৪তম মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ১৯ জুন রোজ শনিবার বাদ মাগরীব টেকদাসেরদিয়া উত্তর পাড়া জামে মাসজিদ, কুরআন তিলাওয়াত করেন হাফেজ সাদ ইমাম অত্র মাসজিদ এতে সভাপত্বিত করেন শাইখ অধ্যাপক আরমানুদ্দিন সভাপতি, কালীন নোয়াগাঁও এলাকা

জমঈয়ত। এতে আলোচনা পেশ করেন শাইখ হাফেজ আব্দুল্লাহ বিন হারিছ, সহ-সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, উপস্থাপনায় মুহাম্মদ রমজান মিয়া সাধারণ সম্পাদক, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান।

দু'আর আবেদন

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী (হাফিযাহুল্লা-হ)'র গলব্লাডারের অপারেশন হয়ে সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারী হাসপাতালে ভর্তি আছেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অতি দ্রুত পরিপূর্ণ সুস্থতা ও নেক হায়াত দান করেন, সেই কামনায় আল্লাহ তা'আলার দরবারে একান্তভাবে দু'আ করছি। পাশাপাশি সকল মুসলিম ভাই-বোনের নিকট তার জন্য দু'আ কামনা করছি। আল্লাহ তা'আলা যেন তাঁকে শিফায়ে কামিলা দান করেন –আমীন।

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَهُ، شفاء عاجلا غير آجل.

মৃত্যু সংবাদ

১. বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস পঞ্চগড় জেলার সম্মানিত সাবেক সেক্রেটারি জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আজ (২৬ জুন-২০২৬, জুমা'বার) দুপুর ১২:০০টায় ইন্তিকাল করেছেন।

﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾

মহান আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস এর উচ্চ মাকাম দান করুন। আল্লাহুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মাননীয় জমঈয়ত সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক ও সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

২. বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আনিছুর রহমান ইন্তেকাল করেছেন। আনন্দ মোহন সরকারি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সমাজহিতৈষী ও বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক আনিছুর রহমান (৮০) গত ২৮ জুন ২০২৬, রবিবার সন্ধ্যায় ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র, দুই কন্যাসহ অসংখ্য শিক্ষার্থী, শুভানুধ্যায়ী, গুণগ্রাহী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। তাঁর ইন্তেকালে দেশের শিক্ষা অঙ্গন, ছাত্রসমাজ এবং শুভানুধ্যায়ী মহল একজন প্রজ্ঞাবান শিক্ষানুরাগী, আদর্শ শিক্ষক ও সজ্জন ব্যক্তিত্বকে হারালো।

অধ্যাপক আনিছুর রহমান ছিলেন একটি ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি ও শিক্ষিত পরিবারের কৃতী সন্তান। তাঁর পিতা বরেণ্য আলেমে দ্বীন মাওলানা রমজান আলী (রহিমাহুল্লাহ) দীর্ঘদিন ঢাকার যাত্রাবাড়ীস্থ মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়ার অধ্যক্ষ হিসেবে সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সাবেক বিচারপতি ও নির্বাচন কমিশনার এ. আর. মাসুদের সহোদর এবং বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মুসলেহুদ্দীনের ভগ্নিপতি ছিলেন।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক এবং সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম তাঁর ইন্তেকালে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এক শোকবার্তায় নেতৃদ্বয় মাইয়্যিতের বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন, শিক্ষা বিস্তার ও মানবসম্পদ উন্নয়নে তাঁর অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তাঁরা শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, সহকর্মী, শিক্ষার্থী ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

নেতৃদ্বয় দুআ করেন, মহান আল্লাহ যেন মরহুমকে ক্ষমা করেন, তাঁর কবরকে জান্নাতের বাগিচাসমূহের একটি বাগিচায় পরিণত করেন, তাঁর নেক 'আমলসমূহ কবুল করেন এবং তাঁকে জান্নাতুল ফেরদৌসের উচ্চ মর্যাদা দান করেন।

৩. গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা এলাকার পিয়ারাপুর নিবাসী মোহাম্মদ আ. কাদের মণ্ডল ৬০ বছর বয়সে গত ২১/০৬/২৬ নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মরহুম স্ত্রী, এক ছেলে ও দুই মেয়েসহ অনেক আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। মরহুমের জানাযার সালাতে মহিমাগঞ্জ এলাকা জমিয়তের সহ-সভাপতি আলহাজ্জ হাবিবুর রহমানসহ এলাকার অনেক গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মরহুমের জন্য দু'আর আবেদন জানিয়েছেন গাইবান্ধা জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি অধ্যাপক আ. সামাদ আজাদ।

কেন্দ্রীয় জমঈয়তের পক্ষ হতে মাইয়িতদের জন্য দু'আ-আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ক্ষমা করুন ও জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন, আমীন।

সকলের কাছে তাদের জন্য দু'আর অনুরোধ রইল।

الفتاوى والمسائل / ফাতাওয়া ও মাসায়িল

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

জিজ্ঞাসা (০১): *বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের সমাজে কিছু মানুষ নিজেদেরকে আহলে কুরআন নামে দাবি করে আসছে। তারা সকল হাদীস অস্বীকার করে। আমার প্রশ্ন: ১. যারা আহলে কুরআন তারা কি মুসলিম নাকি কাফের হয়ে গেছে? ২. তারা মারা গেলে তাদের জানাযা দেওয়া যাবে? ৩. আহলে কুরআন মতবাদে বিশ্বাসী লোকেরা কি কোরবানির পশু জবাই করলে সেই কোরবানি হবে? তাদের বিষয়ে ইসলামের যথাযথ ফতোয়া লিখিত আকারে দিয়ে আমাকে সাহায্য করুন।*

মো. নাজমুল
শেওড়াপাড়া, ঢাকা।

জবাব: যারা সকল হাদীসকে অস্বীকার করে তারা সকল আলেমের মতে কাফের। তারা মারা গেলে তাদের জানাযা দেওয়া হবে না, মুসলিম কবরস্থানে দাফন করা যাবে না, মুসলিম নিয়মে কাফন-দাফন করা যাবে না, গর্ত করে মাটি চাপা দিয়ে দিতে হবে। তাদের কুরবানিসহ কোন ইবাদত কবুল হবে না।

ইবনু বায (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: যারা মনে করেন সমস্ত হাদীসই দলিল না, তারা পথভ্রষ্ট কাফের। এমন ব্যক্তি কার্যত আল্লাহ তা'আলার এই আদেশ অমান্য করছে:

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾

"তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রাসূলেরও আনুগত্য করো।" *(সূরা আন্-নিসা: ৫৯)*

তাদের অবস্থান যেন এ কথাই বলে: "শুধু মহান আল্লাহর আনুগত্য করা হবে, রাসূলের আনুগত্য করা হবে না।" অথচ সুন্নাহই হলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আদেশ ও নিষেধের সমষ্টি। এ কারণেই আল্লাহ সতর্ক করে বলেছেন:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"যারা তাঁর (রাসূলের) আদেশের বিরোধিতা করে, তারা যেন সতর্ক থাকে কোথাও তাদের ওপর কোনো ফিতনা (পথভ্রষ্টতা বা পরীক্ষা) এসে না পড়ে অথবা তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নেমে না আসে।" *(সূরা আন্-নূর: ৬৩)*

তিনি আরো বলেছেন:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

"রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ করো, আর তিনি যা থেকে তোমাদের নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।" *(সূরা আল-হাশর: ৭)*

এছাড়াও নবী (ﷺ) বলেছেন:

أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ.

"আমাকে কুরআন প্রদান করা হয়েছে এবং তার সঙ্গে তার সমপরিমাণ (অর্থাৎ- সুন্নাহও) প্রদান করা হয়েছে।" *(আবূ দাউদ- ৪৬০৪, সহীহ; ফাতাওয়া নূর আলাদ দারব লি ইবন বায- ৪/৩১৫)*

ইমাম ইসহাক ইবনু রাহাওয়াইহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "যে ব্যক্তির কাছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোনো হাদীস পৌঁছে এবং সে হাদীসটি যে সহীহ এ ব্যাপারেও সে নিশ্চিত থাকে; এরপরও যদি কোনো বৈধ তাকিয়্যাহ (প্রাণ বা মারাত্মক ক্ষতির আশঙ্কাজনিত আত্মগোপন) ছাড়াই সে তা প্রত্যাখ্যান করে, তবে সে কাফির।" *(আল-ইহকাম লি ইবনু হাযম- ১/৮৯)*

আল-হাসান ইবনু আলী আল-বারবাহারী তাঁর শারহুস সুন্নাহ গ্রন্থে *(পৃ. ৬৪)* বলেন: "কিবলামুখী (মুসলিম দাবিদার) কোনো ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে বলে গণ্য করা যাবে না, যতক্ষণ না সে আল্লাহ তা'আলার কিতাবের কোনো আয়াত প্রত্যাখ্যান করে অথবা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সুন্নাহ ও হাদীসসমূহের মধ্য থেকে কোনো বিষয় প্রত্যাখ্যান করে। ... অতঃপর যদি সে এর কোনো একটি কাজ করে, তবে তাকে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে বলে গণ্য করা তোমার জন্য অপরিহার্য হয়ে যায়।"

আব্দুর রহমান আল-মু'আল্লিমী আল-ইয়ামানী তাঁর আল-আনওয়ার আল-কাশেফাহ গ্রন্থে *(পৃ. ৮১-৮২)* বলেন: "যে ব্যক্তি সর্বপ্রকার হাদীস অনুযায়ী 'আমল করা ফরয এ বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে, তার কাছে প্রথমে শরয়ী দলিল ও প্রমাণ সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এরপরও যদি সে তার অবস্থানে অটল থাকে, তবে তার কুফর প্রকাশিত হয়ে যায়।

আর যে ব্যক্তি কেবল কিছু হাদীস অনুযায়ী 'আমল করার বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করে, যদি তার কাছে আহলুল ইলমের নিকট স্বীকৃত কোনো গ্রহণযোগ্য ওজর বা তার অনুরূপ কারণ থাকে, তবে সে ওজরগ্রস্ত। কিন্তু এমন কোনো ওজর না থাকলে সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর অবাধ্য হিসেবে গণ্য হবে। আর এরূপ অবাধ্য ব্যক্তি গুনাহগার ও ফাসিক।"

একই মত ব্যক্ত করেছেন ইবনু উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ) ও আব্দুর রাজ্জাক আফীফী।

জিজ্ঞাসা (০২): *আমাদের গ্রামে চারটি মসজিদ আছে। মুসল্লীরা অনেকেই মাজার পন্থী। ওই সকল মসজিদের*

ইমাম ও মোয়াজ্জিনগুলো রেজভিয়া দরবার পানুয়া পুড়ি, কাদেরিয়া তরিকা সারসিনা দরবার এগুলো অনুসরণ করে আমি কি তাদের পিছনে সালাত না পড়ে ঘরে সালাত আদায় করতে পারবো? *মো. আব্দুর রব*

সদর দক্ষিণ, কুমিল্লা।

জবাব: পারবেন ইন্ শা-আল্লাহ। তবে আশেপাশে বিশুদ্ধ 'আক্বীদার মাসজিদ থাকলে সেখানে জামা'আতে সালাত আদায় করতে হবে। যদি না থাকে তাহলে পরিবার নিয়ে বাড়িতেই সালাত আদায় করবেন। কেননা আপনি যাদের কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের মাঝে স্পষ্ট কুফরী 'আক্বীদাহ্ আছে। যার মধ্যে স্পষ্ট কুফরী 'আক্বীদাহ্ থাকবে তার পিছনে জেনে-শুনে সালাত আদায় করলে তা বাতিল হয়ে যাবে।

বেরলভী বা রেজভীরা কাফের। এমন ফাতাওয়া দিয়েছেন ফাতাওয়া আল-লাজনাহ আদ-দায়িমাহ ও ইবনুল উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ) ও তাদের পিছনে সালাত আদায় বৈধ না এমনটাও উল্লেখ করেছেন। *(ইসলাম শাওয়াল ওয়া জাওয়াব প্রশ্ন নং- ১৫০২৬৫)*

জিজ্ঞাসা (০৩): ***ওয়ালির অনুমতি ছাড়া সংঘটিত বিবাহের হুকুম এবং বর্তমান করণীয় সম্পর্কে জানতে চাই। উল্লেখ্য যে, আমাদের বিয়েতে প্রথম ওয়ালির (অভিভাবকের) অনুমতি নেওয়া হয়নি। আমার স্বামী দ্বীনদার ও আর্থিকভাবে স্বচ্ছল; তিনি উপযুক্ত পাত্র ছিলেন। বিবাহের কিছুদিন পর আমাদের উভয় পরিবারের সদস্যরাও বিষয়টি জেনে তা মেনে নেন। এরপর থেকে আমরা স্বামী-স্ত্রী হিসেবে একসঙ্গে বসবাস করে আসছি। বর্তমানে বিভিন্ন বাস্তব কারণে তাৎক্ষণিকভাবে পুনরায় নিকাহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থায় শরিয়তের দৃষ্টিতে আমার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ ও সঠিক করণীয় কী? আমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শরিয়াহ অনুযায়ী 'আমল করতে চাই। অনুগ্রহ করে কুরআন-সুন্নাহ ও গ্রহণযোগ্য ফিকহি মতামতের আলোকে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করলে উপকৃত হব।*** *সুমাইয়া আক্তার, সাভার, ঢাকা।*

জবাব: আপনাদের প্রথম বিবাহ শুদ্ধ হয়নি, তাই শুদ্ধভাবে বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত আলাদা থাকা আবশ্যক। একত্রে থাকলে পাপ হবে। বিবাহ নবায়ন খুব সহজ, আপনার অভিভাবক ২ জন স্বাক্ষীর সামনে শুধু বলবে, আমার মেয়েকে তোমার সাথে বিয়ে দিলাম এবং সে বলবে কবুল করলাম সাথে কিছু মোহরানা ধার্য করবে তাহলেই হয়ে যাবে। **বিস্তারিত:** ওলির (অভিভাবকের) সম্মতি ছাড়া কোনো নারী যদি বিবাহ করে, তবে সেই বিবাহ বাতিল (বাতিল নিকাহ) এবং তা শরীয়তসম্মতভাবে শুদ্ধ নয়, যদিও সেই বিবাহের ওপর দশ বছর অতিবাহিত হয়ে যায় কিংবা তাদের সন্তান-সন্ততি জন্ম নেয়। সুতরাং ওলির সম্মতি নিয়ে নতুন করে নিকাহের আকদ সম্পন্ন করা আবশ্যক। এর দলিল রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বাণী:

«لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ».

"ওলি ছাড়া কোনো নিকাহ শুদ্ধ নয়।" *(আবূ দাউদ- ২০৮৫, সহীহ)*

এছাড়া যে নারী নিজেই নিজের বিবাহ সম্পন্ন করে, তার ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী এসেছে। রাসূল (ﷺ) বলেছেন:

لا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا.

"কোনো নারী অন্য নারীর বিবাহ সম্পন্ন করবে না এবং কোনো নারী নিজেই নিজের বিবাহ সম্পন্ন করবে না। কারণ যে নারী নিজেই নিজের বিবাহ সম্পন্ন করে, সে ব্যভিচারিণীর ন্যায় (অর্থাৎ- গুরুতর গুনাহে লিপ্ত হয়)।" *(ইবনু মাজাহ্- ১৮৮২, সহীহ তবে 'সে ব্যভিচারিণীর ন্যায়' অংশটা দুর্বল)*

যদি পরে ওলি এই বিবাহে সম্মতি দেন, তবুও পূর্বের আকদ শুদ্ধ হয়ে যায় না। কারণ প্রথম আকদটি মূলত শরীয়তসম্মতই ছিল না। তাই নতুন করে সঠিক পদ্ধতিতে নিকাহের আকদ সম্পন্ন করা আবশ্যক।

এছাড়া স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই উচিত, তারা যে ভুল করেছেন সে জন্য আন্তরিকভাবে আল্লাহ তা'আলার কাছে তাওবাহ্ করা। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(ইসলাম শাওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্রশ্ন নং- ১৩৫০১)*

আপনাদের বিবাহ শুদ্ধ করতে হলে, আপনার পিতা বা অভিভাবক কর্তৃক নতুন করে বিয়ে পড়াতে হবে তাহলেই বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে ইন্ শা-আল্লাহ। *(ইসলাম ওয়েব- ফাতাওয়া নং- ৪৭৯৫৩৬)*

জিজ্ঞাসা (০৪): ***ইন্টারনেটের বিভিন্ন নবী-রাসূলগণের অ্যানিমেশন ভিডিও এবং ইসলামিক কার্টুন পাওয়া যায়। এ সকল ভিডিও দেখা কি জায়িয হবে?*** *মোহাম্মদ রাকিবুল ইসলাম, বাগেরহাট।*

জবাব: না, দেখা বৈধ হবে না। নবী ও রাসূলগণের চরিত্রে অভিনয় বা তাঁদের অ্যানিমেশন/নাটক/চলচ্চিত্রে চিত্রায়ণ হারাম হওয়ার বিষয়ে আলেমদের ঐকমত্য (ইজমা) রয়েছে। এ মর্মে বিশ্বের বহু নির্ভরযোগ্য শরয়ী প্রতিষ্ঠান ফাতাওয়া প্রদান করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–

⇨ মিসরের দারুল ইফতা *(খণ্ড: ৭, পৃ. ২০৯)* এ বিষয়ে হারাম হওয়ার ফাতাওয়া প্রদান করেছে।

⇨ সৌদি আরবের স্থায়ী ফাতাওয়া কমিটি *(খণ্ড: ৩, পৃ. ২৬৮)* একই ফাতাওয়া প্রদান করেছে।

⇨ **Muslim World League-এর অধীনস্থ Islamic Fiqh Council:** এ বিষয়ে হারাম হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। [এ সিদ্ধান্তটি পরিষদের অষ্টম অধিবেশনে (১৪০৫

হিজরি) গৃহীত হয়। পরবর্তীতে ২০তম অধিবেশনে, যা মক্কা মুকাররমায় ১৯-২৩ মুহাররম ১৪৩২ হিজরি অনুষ্ঠিত হয়, প্রকাশিত আনুষ্ঠানিক বিবৃতির মাধ্যমে এ সিদ্ধান্ত পুনরায় নিশ্চিত করা হয়।]

⇨ Islamic Research Academy, কায়রো (مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة) একই রায় প্রদান করেছে। *[সিদ্ধান্ত নং- ১০০]*

অতএব, সমসাময়িক নির্ভরযোগ্য ফতোয়া বোর্ড ও ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, নবী-রাসূল ও সাহাবাগণের চরিত্রে অভিনয় করা, তাঁদের অ্যানিমেশন বা চলচ্চিত্রে চিত্রায়িত করা শরীয়তসম্মত নয় এবং তা দেখাও বৈধ নয়। *(ইসলাম শাওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্রশ্ন নং- ১৬৩১০৭, ১৪৪৮৮)*

জিজ্ঞাসা (০৫): ***আমি একটা দোকানে কাজ করি এখানে আমার কাজ অনুযায়ী বেতন অনেক কম। বাড়তি পরিশ্রম করি। আর আমাকে কোন টাকা দেয় না নাস্তা খাওয়ার জন্য আমার নিজের টাকা দিয়ে খাওয়া লাগে। এখন যদি আমি ক্যাশ থেকে টাকা নেই না জানায়ে আমার গুনাহ হবে বা চুরি হবে? একটু কষ্ট করে আমার প্রশ্নের উত্তরটা দিবেন।***

ইয়াসিন, নারায়ণগঞ্জ।

জবাব: না, মালিকের অনুমতি ছাড়া ক্যাশ থেকে গোপনে টাকা নেওয়া জায়িয নয়। আপনার বেতন কম হওয়া বা নাস্তার টাকা না দেওয়া এসব কারণে নিজে থেকে ক্যাশ থেকে টাকা নেওয়া বৈধ হয়ে যায় না। এভাবে নিলে তা খিয়ানত এবং পরিস্থিতিভেদে অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ গ্রহণ হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।" *(সূরা আন্-নিসা: ২৯)*

এছাড়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

"যে তোমার কাছে আমানত রেখেছে, তার আমানত আদায় করে দাও। আর যে তোমার সঙ্গে খিয়ানত করেছে, তার সঙ্গেও তুমি খিয়ানত করো না।" *(আবূ দাউদ- ৩৫৩৪, সহীহ)*

সুতরাং মালিককে না জানিয়ে ক্যাশ থেকে টাকা নেওয়া হারাম হবে। তবে আপনি উল্লেখ করেছেন, আপনাকে দিয়ে বাড়তি কাজ করিয়ে নেয়। অবস্থা যদি এমন হয় যে, চুক্তিভিত্তিক নির্দিষ্ট সময়ের পরেও আপনাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয় কিন্তু অতিরিক্ত কোন পারিশ্রমিক দেয় না, তাহলে তা জুলুম হবে। রাসূল বলেন, "জুলুম কিয়ামতের দিন অনেক অন্ধকারের রূপ ধারণ করবে"- *(বুখারী- ২৪৪৭)*। তাই মালিকের জন্য এরূপ আচরণ হারাম তবে আপনার জন্য উত্তম হবে, এ অতিরিক্ত কাজের পারিশ্রমিক গোপনে না নিয়ে পরকালের জন্য রেখে দেওয়া। আর চাইলে ন্যায্য ও সামাজিক নীতি অনুযায়ী গোপনে আপনার পারিশ্রমিক নিয়ে নিতে পারবেন যদি বড় ফেতনার আশংকা না থাকে তবে কোনোভাবেই ন্যায্য অধিকারের বেশি নেওয়া যাবে না। *(বুখারী- ৫৩৫৯)*

জিজ্ঞাসা (০৬): ***ইসলামে সকল হুকুম আহকাম মাসআলা মাসায়েল জানতে, দেখে দেখে পড়তে এবং শিক্ষা নিতে ওযূ লাগবে কি?*** *খাইরুল ইসলাম, সৌদি আরব।*

জবাব: না, ওযূ লাগবে না। ইসালেম ওযূ আবশ্যক শুধুমাত্র সালাতের জন্য- *(সূরা মায়িদাহ: ৬)*। তবে কুরআন তেলাওয়াতের সময় ওযূ করে নেওয়া উত্তম। কারণ উলামাগণ এ বিষয়ে মতানৈক্য করেছেন তাই মতানৈক্য থেকে মুক্ত থাকতে ওযূ করাই ভালো। অনুরূপভাবে তাওয়াফের সময় ওযূ নিয়েও আলেমদের মতানৈক্য রয়েছে তাই ওযূ করাই উত্তম।

উল্লিখিত তিন অবস্থা ছাড়া অন্য সময় ওযূ আবশ্যক না।

জিজ্ঞাসা (০৭): ***আমি প্রাপ্ত বয়স্ক যুবক ও উপার্যনক্ষম। কিন্তু চাকুরির জটিলতার কারনে এখন আইনি বিবাহ করার অনুমতি নেই। কিন্তু আমি একজনকে পছন্দ করি এবং সেও আমাকে পছন্দ করে। আকদ করলে চাকুরিতে জটিলতা নেই। কিন্তু আমার বাবা এখন বিবাহে রাজি হচ্ছেনা বলে মেয়ের বাসায়ও এখন রাজি হচ্ছেনা। মোটকথা সবাই রাজি আছে কিন্তু চাইছে আরো ৩/৪ বছর পর বিবাহ করি আমরা। এমতাবস্থায় মেয়ে কি বাবার সম্মতি ছাড়া বড় ভাই অথবা কারোরই সম্মতি ব্যতিত আকদ করতে পারবে?*** *সাইফ, সাভার।*

জবাব: শরঈ কোনো কারণ ছাড়া পিতা যদি উপযুক্ত মেয়ের উপযুক্ত পাত্রের সাথে বিয়ে দিতে রাজি না হন তাহলে তার অভিভাবকত্ব বাতিল হয়ে যাবে। এ অবস্থায় ভাইয়ে অভিভাবকত্বে বিবাহ বৈধ হবে ইন্ শা-আল্লাহ।

রাসূল (ﷺ) বলেন, যদি উভয়ের (অভিভাবকদের) মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে শাসক হবেন তার অভিভাবক। কারণ যাদের অভিভাবক নেই তার অভিভাবক শাসক। *(আবূ দাউদ- ২০৮৩, সহীহ)*

সুতরাং বিনা কারণে পিতা বিয়ে দিতে বিলম্ব করতে চাইলে এবং মেয়ে এখনি বিয়ে বসতে চাইলে পিতার অভিভাবকত্ব বাতিল হয়ে যাবে। *(ইসলাম ওয়েব- ফাতাওয়া নং- ১৩৩৪৭৫)*

জিজ্ঞাসা (০৮): ***আমি HSC বা উচ্চ মাধ্যমিকে ওঠার পর অনলাইনে একাডেমিক পড়াশোনার জন্য মোবাইল ফোনে পড়াশোনা শুরু করি। এক্ষেত্রে যারা অনলাইনে পড়ান (তারা শিক্ষক নন, বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ব্যক্তিবর্গ) তারা বিভিন্ন প্রলোভন জাতীয় কথা বলে তাদের কাছে পড়তে বলে। এমনকি তারা কলেজে যাওয়াটাকে গুরুত্বহীন বলে। আমি মোবাইলে পড়তে গিয়ে অন্যান্য সময়নষ্টকারী বিভিন্ন***

বিষয়ের সাথে জড়িয়ে যাই। পর্যায়ক্রমে আমার পড়াশোনার আগ্রহও কমে যায়। ফলে আমি উচ্চমাধ্যমিক এর সিলেবাসও শেষ করতে পারিনি। মাঝেমধ্যে ইন্টারনেট থেকে পড়াশোনা সম্পর্কিত বিভিন্ন খুঁটিনাটি তথ্য দেখি। যদিও ওগুলোর তেমন প্রয়োজন নেই। এতে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়। মাঝেমধ্যে গুনাহের কাজে জড়িয়ে ফেলি। আবার বিভিন্ন ইসলামিক কন্টেন্টও দেখি; পরক্ষণেই গুনাহ হয়। অপ্রয়োজনীয় কাজে সময় দেই। এখন আমি আবার নতুন করে পড়াশোনা শুরু করতে চাচ্ছি ও পরীক্ষা দিতে চাচ্ছি। এ পরিস্থিতিতে স্মার্টফোন ব্যবহার সম্পর্কিত শরীয়া মোতাবেক সমাধান কী? *মো. নাসিফ*

শরীফপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর।

জবাব: আল্লাহ তা'আলা আপনার বিষয়টা সহজ করে দিন এবং আপনাকে উত্তম পথে পরিচালিত করুন। শরীয়তের দৃষ্টিতে যে জিনিস নিজে বৈধ, কিন্তু তা বারবার গুনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেই গুনাহের পথ বন্ধ করা (سد الذرائع) ওয়াজিব হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ﴾

"তোমরা ব্যভিচারের নিকটেও যেও না।" *(সূরা ইসরা: ৩২)*

আল্লাহ "যিনা করো না" বলার পাশাপাশি "যিনার কাছেও যেও না" বলেছেন। অর্থাৎ- গুনাহের উপায় ও মাধ্যম থেকেও দূরে থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ.

"যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে তা পরিত্যাগ করে এমন বিষয় গ্রহণ করো যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে না।"

(তিরমিযী- ২৫১৮, সহীহ)

এছাড়া তিনি বলেছেন:

احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجَزْ.

"যা তোমার উপকারে আসে, তার প্রতি আগ্রহী হও। মহান আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করো এবং দুর্বলতা প্রদর্শন করো না।" *(মুসলিম- ২৬৬৪)*

সুতরাং আপনার কথা অনুযায়ী, (স্মার্টফোনে পড়তে গিয়ে গুনাহে জড়িয়ে পড়েন, অপ্রয়োজনীয় ভিডিও ও তথ্য দেখতে শুরু করেন।) স্মার্টফোন ব্যবহার সঠিক হবে না যেহেতু আপনি পাপে জড়িয়ে পড়েন। আপনার ক্ষেত্রে স্মার্টফোন বর্তমানে উপকারের চেয়ে ক্ষতির মাধ্যম বেশি হয়ে গেছে। তবে যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং পাপ থেকে বিরত থাকতে পারেন, তাহলে স্মার্টফোনের সহযোগিতা নিতে পারবেন ইন্ শা-আল্লাহ।

আপনার বর্ণিত পরিস্থিতি অনুযায়ী, পরীক্ষা পর্যন্ত স্মার্টফোন থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকা আপনার জন্য উত্তম। যদি একান্তই প্রয়োজন হয়, তাহলে কেবল নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহার করুন। কারণ আপনার নিজের অভিজ্ঞতাই প্রমাণ করে যে বর্তমানে এটি আপনার জন্য একটি বড় ফিতনার কারণ। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

"যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য উত্তরণের পথ বের করে দেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রিয্ক দান করেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না।" *(সূরা আত্-ত্বালা-ক্ব: ২-৩)*

আল্লাহ তা'আলা আপনার ইলমে বরকত দান করুন, আপনাকে ফিতনা থেকে হেফাজত করুন এবং দুনিয়া-আখিরাতে সফলতা দান করুন –আমীন।

জিজ্ঞাসা (০৯): *জনৈক ব্যক্তি ভুল করে ফর্য সালাতে সিজদাহ্ থেকে ইমাম সাহেবের আগে মাথা উঠিয়ে নেন। উল্লেখ্য যে, ততক্ষণাত মনে পড়ার সাথে সাথে ইমাম সাহেবের সিজদাহ্ থেকে মাথা উঠানোর আগেই আবার সিজদাহ্ দেন এবং তাজবিহগুলো পড়ে মাথা উঠান। এখন প্রশ্ন হলো– তার সালাত কি শুদ্ধ হয়েছে নাকি নতুন করে সালাত পড়তে হবে?* *কবিরুল ফরাজী*

গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ।

জবাব: সালাত শুদ্ধ হয়েছে। কেননা ভুল করে কোনো কাজ করে ফেললে তাতে পাপ হয় না। *(সূরা বাক্বারাহ: ২৮৬; ইবনু মাজাহ- ২০৪৩, সহীহ)*

তবে ইচ্ছাকৃত এমন কাজে সালাত বাতিল হয়ে যাবে ও রাসূল (ﷺ) ধমক দিয়ে বলেন, আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী (ﷺ) বলেন, তোমাদের কেউ যখন ইমামের পূর্বে মাথা উঠিয়ে ফেলে, তখন সে কি ভয় করে না যে, আল্লাহ তার মাথা গাধার মাথায় পরিণত করে দিবেন, তার আকৃতি গাধার আকৃতি করে দেবেন। *(বুখারী- ৬৯১)*

জিজ্ঞাসা (১০): *আমার এক আত্মীয়ের বাসায় প্রচুর ইঁদুর রয়েছে। এসব ইঁদুর মারার জন্য তারা একটি ফাঁদ ব্যবহার করে থাকেন। যখন এই ফাঁদে কোনো ইঁদুর পরে তখন তারা উক্ত ফাঁদসহ ইঁদুরটিকে একটি পানি ভরা বালটিতে রেখে দেন। যাতে পানিতে ডুবে ইঁদুরটি মারা যায়। আমার প্রশ্ন- এভাবে কোন প্রাণীকে মারা জায়িয আছে কিনা?*

মো. রিফাত আল মাসুম, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

জবাব: ইঁদুরকে যে কোনো কার্যকর উপায়ে হত্যা করা বৈধ। তবে এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত যাতে অপ্রয়োজনীয় কষ্ট বা নির্যাতন না হয়।

অতএব, যদি ডুবিয়ে মারা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে যেমন বিষ প্রয়োগ করে বা কোনো বস্তু নিক্ষেপ করে দ্রুত হত্যা করা সম্ভব হয়, তাহলে সেই পদ্ধতিই অবলম্বন করা উচিত। আর যদি ডুবিয়ে মারা ছাড়া অন্য কোনো কার্যকর উপায় না থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে ডুবিয়েও হত্যা করা যেতে পারে। ইসলামের সাধারণ নীতি হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ... وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوْا الْقِتْلَةَ.

"নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ে উৎকৃষ্ট আচরণ (ইহসান) নির্ধারণ করেছেন... সুতরাং যখন তোমরা হত্যা করবে, তখন উত্তম পদ্ধতিতে হত্যা করবে।" *(মুসলিম- ১৯৫৫)*

জিজ্ঞাসা (১১): ***আমার প্রশ্ন হলো– ইসলামে হিজরাদের বিধান কি? কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিস্তারিতভাবে যানতে ইচ্ছুক।*** *সাঈদ হাসান, ঢাকা।*

জবাব: আপনার প্রশ্নটি ব্যাপক। হিজরাদের কোন বিষয়ে জানতে চেয়েছেন তা অস্পষ্ট। তবু কিছু সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করা যাচ্ছে– বাংলা ভাষায় "হিজড়া" শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। শরীয়তের বিধানও এদের ক্ষেত্রে এক নয়। যেমন-

১. জন্মগতভাবে লিঙ্গ-অস্পষ্ট ব্যক্তি: এদের আরবিতে الخُنثى (খুনসা) বলা হয়। অর্থাৎ- জন্মগতভাবে যার লিঙ্গ-পরিচয় অস্পষ্ট বা উভয় ধরনের যৌন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এটি একটি জন্মগত শারীরিক অবস্থা। এটা দুই প্রকার। যথা-

ক. খুনসা গায়রুল মুশকিল (الخنثى غير المشكل)**:** এমন ব্যক্তি, যার মধ্যে পুরুষত্ব বা নারীত্বের লক্ষণ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। ফলে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায় যে তিনি পুরুষ, অথবা নারী। এ ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারসহ শরীয়তের অন্যান্য সব বিধান তার ক্ষেত্রে সেই লিঙ্গের বিধান অনুযায়ী প্রযোজ্য হবে, যার লক্ষণ তার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

খ. খুনসা মুশকিল (الخنثى المشكل)**:** এমন ব্যক্তি, যার মধ্যে পুরুষত্ব বা নারীত্বের কোনো লক্ষণই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় না; ফলে তিনি পুরুষ না নারী তা নির্ধারণ করা যায় না। অথবা উভয় ধরনের লক্ষণ এমনভাবে বিদ্যমান থাকে যে, সেগুলো পরস্পর বিরোধী হওয়ায় প্রকৃত লিঙ্গ নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে।

দ্রষ্টব্য: বর্তমান যুগে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা (যেমন- ক্রোমোজোম, হরমোন, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রজনন অঙ্গের মূল্যায়ন ইত্যাদি) দ্বারা এই অস্পষ্টতা নিরসন করা সম্ভব হয়। তাই সমসাময়িক ফকীহগণও চিকিৎসাগত নির্ণয়কে গুরুত্ব দিয়ে শরয়ী বিধান প্রয়োগের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে যদি চিকিৎসার মাধ্যমে নির্ণয়ের সম্ভব না হয়, তাহলে তাকে মহিলা নির্ধারণ করে শরিয়তের সকল বিধান কার্যকর করা হবে।

(আল-মাওসুয়াহ আল-ফিকহিয়াহ- ২৩/২০)

২. পুরুষ, কিন্তু নারীর মতো আচরণকারী: এরা জন্মগতভাবে পুরুষ; কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে নারীদের মতো কথা বলে, পোশাক পরে বা চলাফেরা করে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ আচরণের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন:

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নারীদের অনুকরণকারী পুরুষ এবং পুরুষদের অনুকরণকারী নারীদের ওপর লানত করেছেন।" *(বুখারী- ৫৮৮৫)*

চিকিৎসার বিধান যদি কোনো ব্যক্তি জন্মগতভাবে হিজরা হয় এবং চিকিৎসার মাধ্যমে প্রকৃত লিঙ্গ নির্ধারণ সম্ভব হয়, তাহলে চিকিৎসা করানো বৈধ; বরং প্রয়োজনে আবশ্যক।

কিন্তু সুস্থ পুরুষ বা নারী শুধুমাত্র নিজের ইচ্ছায় বিপরীত লিঙ্গে রূপান্তরের জন্য অস্ত্রোপচার করা হারাম *(সূরা নিসা: ১১৯)* যা বর্তমানে অহরহ হচ্ছে। আল্লাহ হেফাজত করুন –আমীন।

জিজ্ঞাসা (১২): ***আমার নিসাব সমপরিমান অর্থ নেই, আমি একজন ক্ষুদ্র মুদি ব্যবসায়ী। আমার ব্যবসার আয় দিয়ে আমি ও আমার পরিবারের এবং বৃদ্ধ বাবার মৌলিক চাহিদাগুলো সঠিকভাবে পূরণ করতে অক্ষম। বৃত্তবান আমার এক মামা তিনি তার যাকাতের অংশ থেকে আমাকে ব্যবসা করে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য কিছু টাকা দিতে চায়। এ বিষয় আমি কি করতে পারি, আমাকে একটি পরিষ্কার মতামত দিবেন প্লীজ।*** *মহিউদ্দীন আহাদ*

পি.টি. আই সড়ক, পিরোজপুর।

জবাব: আপনি অসচ্ছল বা গরিব হওয়ার কারণে আপনার মামা থেকে জাকাতের টাকা নিতে পারবেন। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

"সাদাক্বাহ্ তো শুধু ফকীর, মিসকীন ও সাদাক্বাহ্ আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারীদের জন্য, যাদের অন্তর আকৃষ্ট করতে হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তিতে, ঋণ ভারাক্রান্তদের জন্য, আল্লাহ পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহ পক্ষ থেকে নির্ধারিত। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।" *(সূরা তাওবাহ: ৬০)*

উক্ত আয়াতে ফকীর বা মিসকিনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় আপনার জন্য যাকাত গ্রহণ বৈধ ইন্ শা-আল্লাহ।

তবে আত্মীয়কে দান করার ফযিলত বেশি।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: (অনাত্মীয়) গরীব-মিসকীনকে যাকাত দান করলে তা যাকাতই (যাকাতের সওয়াব পাওয়া যায়)। আর আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত দিলে দ্বিগুণ (যাকাতের সওয়াব এবং আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষার সওয়াব) হয়। *(নাসায়ী- ২৫৮২; আহমাদ- ১৫৭৯৪, সহীহ)*

জিজ্ঞাসা (১৩): ***আমার মা ওয়ারিশ হিসেবে যে সম্পত্তি পেয়েছে নানার কাছ থেকে, সেটা সে মামাদের দিয়ে আমাদের বঞ্চিত করলে আমার মা গুনাহগার হবে কিনা?*** *মো: নাছিম মিয়া*

ভীমেরকান্দা, মুনসুরাবাদ, ভাঙ্গা, ফরিদপুর।

জবাব: যদি তিনি শুধুমাত্র নিজের ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি মামাদের দিয়ে দেন, তাহলে এটি শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় কাজ এবং গুনাহের কাজ। *(সূরা আন্-নিসা: ১২)*

অন্যদিকে, যদি তিনি স্বাধীনভাবে, কোনো চাপ ছাড়াই, বৈধ কারণে নিজের সম্পদ থেকে কিছু বা সব মামাদের দান করেন, তাহলে মূল দানের দিক থেকে তা বৈধ। যেমন- আবূ বক্‌র সমুদয় দান করেছিলেন। তবে ওয়ারিসদের জন্য রাখবে এটাই উত্তম। *(বুখারী- ১২৯৫)*

তবে মৃত্যুকালীন অসুস্থতা বা অসিয়ত হিসেবে সম্পূর্ণ সম্পদ দান করতে পারবে না। *(বুখারী- ১২৯৫)*

জিজ্ঞাসা (১৪): ***জনাব, তিন ব্যক্তি মিলে এক লক্ষ টাকা করে দিয়ে একটি হিফয মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা করেছে। মাস শেষে যাবতীয় খরচ মিটানোর পর বাকি টাকা তিনজনে ভাগ করে নেন। জায়িয হবে কি-না?*** *মো. মামুন, রংপুর।*

জবাব: বৈধ হবে, কেননা এটা শরিকানা ব্যবসা। তবে শর্ত হচ্ছে, দানের টাকা থেকে বাঁচিয়ে নেওয়া যাবে না। ছাত্রদের থেকে প্রাপ্ত টাকা যাবতীয় খরচ করার পর বাঁচলে নিতে পারবেন।

জিজ্ঞাসা (১৫): ***আমার ভাই এবং ভাবি 'উমরাহ্ করার জন্য বাসা থেকে ইহরাম পরে ঢাকা বিমান বন্দর আসেন, বিমানবন্দরে এসে জানতে পারেন সৌদি আরব সরকার হজ্জের কারণে 'উমরাহ্ হজ্জ বন্ধ করে দিয়েছেন। এখন তারা বাসায় ফিরে আসছেন, আল্লাহ তা'আলা চাহে তো তারা 'উমরাহ্ হজ্জ চালু হলে আবার আসবেন ইন্ শা-আল্লাহ। এখন কি তাদের কোনো দম দিতে হবে?***

মোহাম্মদ রাসেল, আল খোবার, সৌদী আরব।

জবাব: তারা যদি শুধু ইহরামের কাপড় পড়ে থাকেন কিন্তু ইহরামের নিয়ত করেননি তাহলে কিছু করতে হবে না। তবে যদি ইহরামের নিয়ত করে থাকেন তাহলে দম দিতে হবে, একটা ছাগল বা গরুর সাত ভাগের এক ভাগ। যে অঞ্চলে বাঁধাপ্রাপ্ত হবেন সেখানে তা যবেহ করে মিসকিনদের বন্টন করে দিতে হবে। এরপর মাথার চুল মুন্ডন বা কর্তন করে হালাল হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "অতঃপর যদি তোমরা বাঁধা প্রাপ্ত হও তাহলে সহজলভ্য হাদঈ প্রদান করো।" *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ১৯৬)*

তবে যদি হাদঈ দেওয়ার ক্ষমতা না থাকে তাহলে চুল মুণ্ডন বা কর্তন করে হালাল হয়ে যাবে। *(ইসলাম শাওয়াল ওয়া জাওয়াব- প্রশ্ন নং- ১২৭৩৯৮)*

জিজ্ঞাসা (১৬): ***আমি আমার মায়ের একমাত্র মেয়ে (২০ বছর)। আমার জন্মদাতা পিতার সাথে আমি ছোট থাকতেই আম্মুর ডিভোর্স হয়। এর পর আমি ছোট থাকতে আম্মা ২য় বিয়ে করে। আমি এখন আমার বর্তমান আব্বুর কাছেই আছি আম্মার ২য় বিয়ে থেকেই। পূর্বের পিতা আমার কোনো খোঁজ খবর নেই না, খরচ ও দেই না এবং শুনেছি ওনার ২য় স্ত্রীর বর্তমানে ৩টা ছেলে আছেন! ১. যেহেতু উনি যোগাযোগ করে না। এরপর ও কি মেয়ে হিসেবে আমার কোনো দায়িত্ব আছে ওনার প্রতি-যা আমার পালন করতেই হবে? যদি থাকে কি দায়িত্ব একটু বলবেন? ২. আমি শুনেছি পিতার অনুমতি ছাড়া মেয়েদের বিয়ে হয় না। কিছুদিন পর হয়তো আমার বিয়ে হবে। আমার বিয়ের সময় কি ঐ পিতার অনুমতি লাগবে? নাকি আম্মু ও বর্তমান আব্বুর অনুমতি হলে হবে?*** *তাসমিয়া, ফেনি।*

জবাব: আল্লাহ তা'আলা আপনার অবস্থা সহজ করে দিন এবং উত্তম ফায়সালা দান করুন।

১. জন্মদাতা পিতার প্রতি আপনার দায়িত্ব কী?

যদিও আপনার জন্মদাতা পিতা আপনাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন, খোঁজখবর নেন না এবং ভরণপোষণও দেননি, তবুও তিনি আপনার শরয়ী পিতা। তালাকের মাধ্যমে পিতা-মেয়ের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না। তাই আপনার দায়িত্ব হলো– তাঁর সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করা। তথা কল করা, যোগাযোগের চেষ্টা করা। তিনি যোগাযোগ করলে ভদ্র ও সম্মানজনক আচরণ করা। তাঁর জন্য দু'আ করা। তিনি অসুস্থ বা অভাবগ্রস্ত হলে এবং আপনার সামর্থ্য থাকলে প্রয়োজনে সাহায্য করা।

তিনি আপনার প্রতি নিজের দায়িত্ব পালন না করার কারণে পাপী হবেন। কিন্তু আপনিও যদি তাঁর হক্ব আদায় না করেন তাহলে আপনিও পাপী হবেন। আল্লাহ বলেন:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا﴾

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সঙ্গে সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি।" *(সূরা আল-আহ্ক্বা-ফ: ১৫)*

২. আপনার বিয়েতে কার অনুমতি (ওলি) লাগবে?

আপনার শুনা বা জানা সঠিক। আপনার সৎ বাবা (বর্তমান আব্বু) তিনি শরয়ী ওলি নন। জন্মদাতা পিতা মূলত তিনিই আপনার ওলি। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

"ওলি ছাড়া কোনো নিকাহ (শুদ্ধ) নয়।" *(আবূ দাউদ- ২০৮৫, সহীহ)*

আপনার পিতা জীবিত, তাই বিয়ের সময় প্রথমে তাঁর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করবেন। যদি তিনি অকারণে অস্বীকার করেন বা যোগাযোগই সম্ভব না হয়, তাহলে শরীয়ত অনুযায়ী ওলিয়াতের অধিকার পরবর্তী নিকট আত্মীয়ের কাছে যাবে (যেমন- দাদা, ভাই, চাচা ইত্যাদি)। আর যদি এমন কেউ না থাকেন, তাহলে মুসলিম বিচারক (কাজী) বা তাঁর প্রতিনিধিত্বকারী শরয়ী কর্তৃপক্ষ ওলির দায়িত্ব পালন করবেন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

"যার কোনো (যোগ্য) ওলি নেই, শাসক (বা তার প্রতিনিধিত্ব কারী বিচারক) তার ওলি।" *(আবূ দাউদ- ২০৮৩, সহীহ)*

জিজ্ঞাসা (১৭): ***কোনো ব্যক্তি যদি ব্যায়াম করে শুধুমাত্র মানুষদের দেখানোর জন্য নিজের শরীর প্রদর্শন করার জন্য যাতে মানুষ বাহবা দিবে এটা কি ছোট শির্ক-এর অন্তর্ভুক্ত হবে?*** *ইশান, কুয়া, নোয়াখালী।*

জবাব: না, ছোট শির্কের অন্তর্ভুক্ত হবে না তবে তার নিয়ত পরিশুদ্ধ করলে নেকী পাবে। রিয়া মূলত ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত। যেহেতু ব্যায়াম ইবাদত না তাই এখানে শির্ক হবে না। ***(ইসলাম শাওয়াল ওয়া জাওয়াব- নং- ৫৬৮৭৩৬)***

জিজ্ঞাসা (১৮): ***স্ত্রী কী স্বামীর নাম ধরে ডাকতে পারবে কুরআন ও হাদীস থেকে বলুন? স্বামী স্ত্রীকে বোন এবং স্ত্রী স্বামীকে ভাই বলতে পারবে কি?*** *মো. জোবায়ের হোসেন রংপুর।*

জবাব: স্ত্রী স্বামীকে নাম ধরে ডাকতে পারে, কুরআন বা সহীহ হাদীসে এর কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

তবে সম্মান, ভদ্রতা ও প্রচলিত সামাজিক রীতি বজায় রাখা উত্তম। যদি কোনো সমাজে নাম ধরে ডাকাকে অসম্মানজনক মনে করা হয়, তাহলে এমন সম্বোধন থেকে বিরত থাকবে যাতে পারস্পরিক সম্মান বজায় থাকে। আল্লাহ বলেন:

﴿وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ﴾

"তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সঙ্গে সদাচরণের ভিত্তিতে বসবাস করো।" ***(সূরা আন্-নিসা: ১৯)***

এখানে بِالْمَعْرُوْفِ বলতে শরীয়তসম্মত ও সমাজে প্রচলিত উত্তম আচরণ বোঝানো হয়েছে। হাদীসের প্রমাণ–

'আয়িশাহ্ বিনতু আবূ বক্র (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বহু হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে يَا رَسُوْلَ اللهِ (হে আল্লাহর রাসূল!) বলে সম্বোধন করেছেন। আবার নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে কখনো يَا عَائِشَةُ, কখনো يَا عائش বলে ডাকতেন। এ থেকে বোঝা যায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্নেহপূর্ণ ও সম্মানজনক বিভিন্ন সম্বোধন বৈধ। স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে ভালোবেসে, আদর করে ভাই- বোন বলে ডাকতে পারবে ইন্ শা-আল্লাহ। এ বিষয়ে ইবনু উসাইমিন (রহিমাহুল্লাহ)-কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন,

"হ্যাঁ, স্বামী তার স্ত্রীকে 'হে আমার বোন! কিংবা এ ধরনের ভালোবাসা ও আন্তরিকতা প্রকাশকারী শব্দ দিয়ে সম্বোধন করতে পারে। যদিও কিছু আলেম এ ধরনের সম্বোধনকে অপছন্দ (মাকরূহ) বলেছেন, কিন্তু এ মতের পক্ষে শক্ত কোনো ভিত্তি নেই। কারণ সকল কাজের বিচার নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। এ ব্যক্তি এ কথার দ্বারা এ উদ্দেশ্য করেনি যে, সে তার স্ত্রীকে প্রকৃত অর্থে নিজের বোন বা মাহরাম মনে করছে; বরং তার উদ্দেশ্য হলো স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও স্নেহ প্রকাশ করা। স্বামী বা স্ত্রী উভয়ের পক্ষ থেকেই যে কোনো বৈধ উপায়ে যদি পারস্পরিক ভালোবাসা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়, তবে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে কাম্য ও প্রশংসনীয়।" ***(ফাতাওয়া নূর আলাদ দারব লি ইবন উসাইমিন- কিতাবুন নিকাহ, অধ্যায়: যিহার)***

উল্লেখ যে, আবূ তামীমাহ আল-হুজাইমী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলল, হে আমার বোন! রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বললেন: সে কি তোমার বোন? তিনি তার এরূপ সম্বোধনরকে অপছন্দ করলেন এবং এরূপ করতে নিষেধ করলেন। ***(আবূ দাউদ- ২২১০, হাদীসটা দুর্বল)***

জিজ্ঞাসা (১৯): ***সমকামিতার বিধান কি? সমকামিতা কি যিনার মতো পাপ কাজ? তাওবাহ্ করলে কি মাফ হবে? জানতে চাই।*** *মো. জোবায়ের হোসেন, রংপুর।*

জবাব: সমকামিতা হারাম, এ অপরাধে আল্লাহ লূত (আলাইহিস সালাম)-এর জাতিকে ধ্বংস করেছেন। আল্লাহ তা'আলা লূত (আলাইহিস সালাম)-এর কওম সম্পর্কে বলেন:

﴿أَتَأْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِيْنَ ○ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُوْنَ﴾

"তোমরা কি সৃষ্টিজগতের পুরুষদের কাছে কামনা চরিতার্থ করতে যাও, আর তোমাদের রব তোমাদের জন্য যে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকে ছেড়ে দাও? বরং তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।" ***(সূরা আশ্-শু'আরা-: ১৬৫-১৬৬)***

আরো বলেন:

﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُوْنِ النِّسَاءِ﴾

"তোমরা তো নারীদের পরিবর্তে কামবশে পুরুষদের নিকট গমন করো।" ***(সূরা আল-আ'রাফ: ৮১)***

এটি কি যিনার মতো? এ বিষয়ে আলেমদের তিনটি মত রয়েছে। যথা-

প্রথম মত: আবূ বক্র, 'আলী ইবনু আবী তালিব, খালিদ, 'আব্দুল্লাহ ইবনু মা'মার (রাযিয়াল্লাহু আনহু), ইবনু শিহাব, রাবী'আহ্ ইবনু আবি 'আব্দুর রহমান, ইমাম মালেক, ইমাম ইসহাক, ইমাম আহমাদ ও ইমাম শাফে'য়ী এ মত পোষণ করেন যে, সমকামী যৌনাচারের শাস্তি ব্যভিচারের শাস্তির চেয়েও কঠোর। আর এর শাস্তি হলো সকল অবস্থায় মৃত্যুদণ্ড, সে বিবাহিত হোক বা অবিবাহিত।

দ্বিতীয় মত: 'আত্বা ইবনু আবি রাবাহ, হাসান বসরী, সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, ইব্রা-হীম আন্-নাখঈ, আল-আওযাঈ, ইমাম শাফে'য়ী (তাঁর প্রসিদ্ধ মাযহাব অনুযায়ী), ইমাম আহমাদ (অন্য বর্ণনা অনুযায়ী), আবূ ইউসুফ এবং মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান আশ্-শায়বানী –এঁদের মতে, সমকামী যৌনাচার ও ব্যভিচারের শাস্তি একই।

তৃতীয় মত: আল-হাকিম এবং আবূ হানিফাহ্'র মতে, সমকামী যৌনাচারের শাস্তি ব্যভিচারের শাস্তির চেয়ে কম,

আর তা হলো তা'যীর (বিচারকের নির্ধারিত শাস্তি)। অধিকাংশ আলেম মত প্রথমটি গ্রহণ করেছেন। *(আল-জাওয়াবুল কাফী- ১৪৮)*

তাওবাহ্ করলে কি ক্ষমা হবে? অবশ্যই হবে, যদি তাওবাহ্ আন্তরিক হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾

"বলুন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর সীমালঙ্ঘন করেছ! তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব গুনাহ ক্ষমা করেন।" *(সূরা যুমার: ৫৩)*

তাওবার শর্ত: ১. গুনাহ সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়া। ২. আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হওয়া। ৩. ভবিষ্যতে আর না করার দৃঢ় সংকল্প করা। ৪. যদি অন্যের অধিকার নষ্ট হয়ে থাকে, তা ফিরিয়ে দেওয়া বা ক্ষমা চাওয়া। যদি এই শর্তগুলো পূরণ করে তাওবাহ্ করা হয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রহমতে সেই গুনাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন।

জিজ্ঞাসা (২০): *ছেলে মেয়ের বিবাহের জন্য নূন্যতম বয়স কত? ইসলামে বিবাহের নির্দিষ্ট বয়স আছে কি?*

মো. জোবায়ের হোসেন, রংপুর।

জবাব: শরীয়তে পুরুষ বা নারীর বিয়ের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়নি; বরং আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলের এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েরও বিয়ে দেওয়া বৈধ, যদি পিতা তার মেয়েকে উপযুক্ত (কুফু/সমমানের) পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেন।

কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমা (আলেমদের ঐকমত্য) দ্বারা প্রমাণিত যে, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই কন্যার নিকাহ শুদ্ধ হতে পারে এবং এর জন্য শরীয়তে কোনো নির্দিষ্ট বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়নি।

ইবনু আব্দিল বার (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, পিতা তার অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যার বিয়ে দিতে পারেন এবং এ বিষয়ে তার মতামত নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে বিবাহ করেছিলেন, যখন তাঁর বয়স ছিল ছয় বা সাত বছর। তাঁর পিতা আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলেন।" *(ইসতেজকার- ১৬/৪৯)* একই কথা বলেছেন ইবনুল কুদামাহ। *(আল-মুগনী- মাসয়ালা নং- ৫২০০)*

অপ্রাপ্তবয়স্ক কন্যার নিকাহ বৈধ হওয়ার দলিল হিসেবে আল্লাহ তা'আলার এ বাণীও উল্লেখ করা হয়:

﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾

"তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ঋতুস্রাব থেকে নিরাশ (বয়োবৃদ্ধ) হয়ে গেছে যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে তাদের ইদ্দত তিন মাস। আর যারা এখনো ঋতুস্রাব শুরু করেনি, তাদেরও ইদ্দত তিন মাস।" *(সূরা আত্-ত্বালা-ক্: ৪)*

আলেমগণ বলেন, এ আয়াতে যারা এখনো ঋতুবতী হয়নি তাদের জন্যও ইদ্দতের বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে। ইদ্দত কেবল বৈধ নিকাহের পর তালাক বা নিকাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, তাদের নিকাহ সংঘটিত হওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। আর অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় সে সময় তাদের সম্মতি গ্রহণকে শর্ত করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন:

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আমাকে বিয়ে করেন যখন আমার বয়স ছিল ছয় বছর। আর তিনি আমার সঙ্গে দাম্পত্য জীবন শুরু করেন যখন আমার বয়স ছিল নয় বছর।" *(বুখারী- ৩৮৯৪)*

সুতরাং শরিয়তে বিবাহের জন্য নির্দিষ্ট কোনো বয়স নেই। তাই বিয়ের বয়স নির্ধারণ করা শরিয়ত বিরোধী কাজ হিসেবে গণ্য হবে।

জিজ্ঞাসা (২১): *নবী করিম (ﷺ) হাদীস অনুযায়ী 'আমল করার জন্য কোন হাদীসে বলেছেন? বিস্তারিত রেফারেন্সসহ জানতে চাচ্ছি।*

মুহাম্মদ ফোরকান পাটোয়ারী
হালিশহর, চট্টগ্রাম।

জবাব: নবী (ﷺ) নিজেই বহু সহীহ হাদীসে তাঁর সুন্নাহর অনুসরণ ও তাঁর আদেশ মানার নির্দেশ দিয়েছেন। নিচে সহীহ হাদীস থেকে দলিল উল্লেখ করা হলো–

১. সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরার নির্দেশ: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ مِنْ بَعْدِيْ، تَمَسَّكُوْا بِهَا، وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

অতএব, তোমরা আমার সুন্নাহ এবং আমার পরে হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহকে অবশ্যই অনুসরণ করবে। তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং মাড়ির দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে রাখবে। *(আবূ দাউদ- ৪৬০৭, সহীহ)*

২. কুরআনের পাশাপাশি সুন্নাহও প্রদান করা হয়েছে– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "সাবধান! আমাকে কুরআন দেওয়া হয়েছে এবং তার সঙ্গে তার অনুরূপ (সুন্নাহ)ও দেওয়া হয়েছে।" *(আবূ দাউদ- ৪৬০৪, সহীহ)*

৩. নবীর আদেশ অমান্য করার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী: রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "আমার উম্মতের সবাই জান্নাতে প্রবেশ করবে, তবে যে অস্বীকার করবে সে ছাড়া।" সাহাবীগণ বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! কে অস্বীকার করবে?" তিনি

বললেন, "যে আমার আনুগত্য করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে, সেই-ই (জান্নাতে যেতে) অস্বীকার করেছে।" *(বুখারী- ৭২৮০)*

৪. নবীর নিষেধ অমান্যকারীদের সম্পর্কে: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "আমি যখন তোমাদের কোনো বিষয় থেকে নিষেধ করি, তখন তা থেকে বিরত থাকো। আর যখন কোনো বিষয়ে আদেশ করি, তখন তোমাদের সাধ্যানুযায়ী তা পালন করো।" *(বুখারী- ৭২৮৮)*

৫. সুন্নাহ বর্জনের নিন্দা: রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "যে আমার সুন্নাহ থেকে বিমুখ হবে, সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয়।" *(বুখারী- ৫০৬৩)*

৩. বিদায় হজ্জের ভাষণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "আমি তোমাদের মাঝে এমন দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না মহান আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাহ।" *(ইমাম মালিক, মুরসাল সনদে)*

জিজ্ঞাসা (২২): ***ইসলামে দাড়ি রাখার বিধান কি? কতটুকু রাখলে সেটা দাড়ি হিসেবে গণ্য হবে? দাড়ির পরিপূর্ণ আদর্শ মাপ কিরকম হওয়া উচিত? কেও যদি ছোট দাড়ি রেখে সে কি গুনাহগার হবে? এ ক্ষেত্রে অনেক ফাতাওয়া দেখা যায়, আপনাদের মতামত কি?*** *ফাহিম ফায়সাল রংপুর।*

জবাব: দাড়ি রাখা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাহ ও মুসলিম পুরুষের স্বতন্ত্র পরিচয়ের অন্যতম নিদর্শন।

১. দাড়ি রাখার বিধান: অধিকাংশ আলেম হানাফি, মালিকি, হাম্বলি এবং শাফে'য়ী মাযহাবের বহু আলেমের মতে দাড়ি রাখা ওয়াজিব, আর ইচ্ছাকৃতভাবে তা কামিয়ে ফেলা হারাম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "দাড়ি বৃদ্ধি করো এবং গোঁফ ছোট করো।" *(বুখারী- ৫৮৯২; মুসলিম- ২৫৯)*

আরো এসেছে– وَفِّرُوا اللِّحَى.

"দাড়িকে পূর্ণভাবে বাড়তে দাও।" *(বুখারী- ৫৮৯২)*

আরো এসেছে– أَرْخُوا اللِّحَى، خَالِفُوا الْمَجُوسَ. "দাড়ি ছেড়ে দাও এবং অগ্নিপূজকদের বিরোধিতা করো।" *(মুসলিম- ২৬০)*

এগুলো সব আদেশসূচক বাক্য। এ কারণেই অধিকাংশ আলেম এটিকে ওয়াজিব বলেছেন।

২. দাড়ি কতটুকু হলে দাড়ি বলা হবে?

দাড়ির জন্য শরীয়তে কোনো নির্দিষ্ট বা মুস্তাহাব দৈর্ঘ্য নির্ধারিত নেই। কারণ এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) থেকে কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাও পাওয়া যায়নি। সহীহ সুন্নাহ দ্বারা যা প্রমাণিত হয়েছে তা হলো, দাড়িকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে দেওয়া। জাবির ইবনু সামুরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন:

"كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) كَثِيْرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ".

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দাড়ি ছিল ঘন ও অধিক লোমবিশিষ্ট।" *(মুসলিম- ২৩৪৪)*

বারা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: «كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) كَثَّ اللِّحْيَةِ».

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দাড়ি ছিল ঘন।" *(নাসায়ী- ৫২৩২)*

অন্য বর্ণনায় এসেছে– "তাঁর দাড়ি ছিল অত্যন্ত ঘন।"

কিছু আলেম 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র 'আমলেরভিত্তিতে এক মুষ্টির অতিরিক্ত অংশ ছাঁটার অনুমতি দিয়েছেন। তবে অধিকাংশ আলেম এটিকে মাকরূহ (অপছন্দনীয়) বলেছেন। পূর্বে বর্ণিত দলিলগুলোর আলোকে এ মতটিই অধিক শক্তিশালী।

ইমাম নববী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "নির্বাচিত (অধিক গ্রহণযোগ্য) মত হলো– দাড়িকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে দেওয়া এবং কোনো ধরনের ছাঁটাই না করা।" *(তুহফাতুল আহওয়াজী- ৮/৩৯)*

আর যে হাদীসটি প্রচলিত আছে–

كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها.

"রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর দাড়ির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ থেকে ছাঁটতেন।" এটি একটি জাল (বানোয়াট) ও মিথ্যা হাদীস; এর কোনো গ্রহণযোগ্য ভিত্তি নেই। *(আল-ইলাল আল-মুতানাহিয়াহ- ২/৬৮৬)*

৩. ছোট দাড়ি রাখলে কি গুনাহ হবে?

শাইখ ইবনু উসাইমিন (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "আরবি ভাষাবিদদের বর্ণনা অনুযায়ী দাড়ির اللحية সীমা হলো– মুখমণ্ডল, দুই চোয়াল (লাহইয়াইন) এবং দুই গালের সমস্ত লোম। অর্থাৎ- দুই গাল, দুই চোয়াল ও থুতনির ওপর যে সব লোম রয়েছে, সবই দাড়ির অন্তর্ভুক্ত।

এ থেকে কোনো অংশ কেটে ফেলা বা ছাঁটাই করাও (মূলত) গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। কারণ রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: "দাড়ি বাড়তে দাও।" "দাড়ি ছেড়ে দাও।" "দাড়ি পূর্ণভাবে বাড়াও।" "দাড়িকে পূর্ণ রাখো।"

এ সব হাদীস প্রমাণ করে যে, দাড়ি থেকে কিছু কেটে নেওয়া বৈধ নয়। তবে গুনাহের মাত্রা একরকম নয়। সম্পূর্ণ দাড়ি কামিয়ে ফেলা, দাড়ি থেকে সামান্য কিছু কেটে নেওয়ার চেয়ে অনেক বড় গুনাহ। কারণ এতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নির্দেশের বিরোধিতা আরো স্পষ্ট ও গুরুতরভাবে প্রকাশ পায়।" *(ফাতাওয়া নূর আলাদ দারব লি ইবন উসাইমিন- কিতাবুত ত্বহারাত, অধ্যায়: সুনানুল ফিতরা)*

জিজ্ঞাসা (২৩): ***গান-বাজনা যে হারাম তার দলিল কি? বিস্তারিত দলিলসহ জানতে চাচ্ছি?*** *মো. বেলায়েত ধামরাই, ঢাকা।*

জবাব: গান-বাজনা হারামের দলিল জানতে দেখুন: সূরা লুক্বমা-নং ৬, সূরা আল-ইসরা: ৬৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

لَيَكُوْنَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ.

"আমার উম্মতের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই হবে, যারা ব্যভিচার, রেশম, মদ এবং বাদ্যযন্ত্রকে হালাল মনে করবে।" *(বুখারী- ৫৫৯০)*

এ হাদীসে المعازف। অর্থ বাদ্যযন্ত্র।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার উপর হারাম করেছেন অথবা হারাম করা হয়েছে মদ, জুয়া এবং যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র। তিনি আরো বলেন, নেশা উদ্রেককারী সকল জিনিস হারাম। সুফিয়ান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি 'আলী ইবনু বাযীমাকে 'কুবাহ' সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, তা হলো তবলা বা ঢোল। *(আবূ দাউদ- ৩৬৯৬, সহীহ; বিস্তারিত জানতে দেখুন: তাহরিমু আলাতীত তরব লিল আলবানী [রাহিমাহুল্লাহ])*

জিজ্ঞাসা (২৪): ***সুন্নাত ও নফল সালাত না পড়লে গুনাহ হবে কি? নাকি মাঝে মাঝে ছেড়ে দেয়া যাবে?*** *মো. বেলায়েত, ধামরাই, ঢাকা।*

জবাব: না, কোনো গুনাহ হবে না, তবে অবজ্ঞা করলে সমস্যা আছে। একজন সচেতন মুসলিম সুন্নাত সালাত কখনই বর্জন করতে পারেন না। কেননা হাদীস এসেছে, কিয়ামতের দিন বান্দার কাজসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নেয়া হবে। যদি (নিয়মিতভাবে) ঠিকমত নামায আদায় করা হয়ে থাকে তবে সে নাজাত পাবে এবং সফলকাম হবে। যদি নামায নষ্ট হয়ে থাকে তবে সে ব্যর্থ ও বিপর্যস্ত হবে। যদি ফর্‌য নামাযের মধ্যে কিছু কমতি হয়ে থাকে তবে মহান আল্লাহ তা'আলা বলবেন, দেখো, বান্দার কোনো নফল নামায আছে কি না। থাকলে তা দিয়ে ফর্‌যের এ ঘাটতি পূরণ করা হবে। তারপর সকল কাজের বিচার পালাক্রমে এভাবে করা হবে। *(তিরমিযী- ৪১৩; ইবনু মাজাহ্- ১৪২৫, সহীহ)*

সুতরাং যে সুন্নাত সালাত ছেড়ে দিবে সে অনেক কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হবে।

জিজ্ঞাসা (২৫): ***কারো নাম আব্দুল মুত্তালিব রাখা যাবে কি?*** *আব্দুল্লাহ, ঢাকা।*

জবাব: আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব প্রকাশ করে এমন নাম রাখা হারাম। যেমন- আব্দুল মাসীহ, 'আব্দুল কাবা এবং এ ধরনের অন্যান্য নাম। তবে 'আব্দুল মুত্তালিব' নামের ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাব (রাহিমাহুল্লাহ) ইবনু হাজম (রাহিমাহুল্লাহ)'র বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন: "আলেমগণ একমত যে, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব প্রকাশ করে এমন সব নাম রাখা হারাম। যেমন- 'আবদু আম্‌র', 'আব্দুল কাবা এবং এ ধরনের অন্যান্য নাম। তবে 'আব্দুল মুত্তালিব'-এর বিষয়টি ব্যতিক্রম।"

এই নামটি আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যের দাসত্ব প্রকাশকারী নাম হওয়া সত্ত্বেও, এর হারাম হওয়ার ব্যাপারে সর্বসম্মত ঐকমত্য (ইজমা) নেই; বরং এ বিষয়ে আলেমদের মতভেদ রয়েছে।

একদল আলেম 'আব্দুল মুত্তালিব' নাম রাখা বৈধ বলেছেন। তাঁদের দলিল হলো– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন:

"আমি নবী, এতে কোনো মিথ্যা নেই; আমি আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর।" *(বুখারী- ২৮৬৪)*

তাঁদের বক্তব্য হলো– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজেই এ নাম ব্যবহার করেছেন এবং এর উল্লেখ করেছেন। এটি প্রমাণ করে যে, এ নামে নাম রাখা বৈধ।

অপরদিকে অন্য একদল আলেম 'আব্দুল মুত্তালিব' নাম রাখাকে হারাম বলেছেন। কারণ, তাঁদের মতে এটিও আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্যের দাসত্ব প্রকাশকারী নাম।

তাঁরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর উক্তি, "আমি আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর।" এর ব্যাখ্যায় বলেন: এটি এ নামের বৈধতার অনুমোদন নয়; বরং কেবল একটি বাস্তব তথ্যের বর্ণনা। অর্থাৎ- নবী (ﷺ) জানিয়েছেন যে, তাঁর দাদার নাম ছিল 'আব্দুল মুত্তালিব'। এর দ্বারা এ নাম রাখা বৈধ কি না সে বিষয়ে কোনো বিধান প্রমাণিত হয় না।

সতর্কতাবশত, এ নাম না রাখাই উচিত।

জিজ্ঞাসা (২৬): ***সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী মতানৈক্য করলে, কার কথা ধর্তব্য হবে?*** *উবায়দুল্লাহ ঠাকুরগাঁও।*

জবাব: সন্তানের নামকরণ মূলত পিতার অধিকার। কারণ সন্তান বংশগতভাবে পিতার দিকেই সম্বন্ধিত হয়।

ইমাম ইবনুল ক্যায়িম (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "সন্তানের নামকরণ পিতার অধিকার, মাতার নয়। এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। যদি পিতা-মাতার মধ্যে সন্তানের

নাম নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়, তবে নামকরণের অধিকার পিতারই থাকবে।

এটি এ কারণেও যে, সন্তানকে তার পিতার দিকেই সম্বন্ধ করা হয়, মাতার দিকে নয়। তাই বলা হয়: 'অমুক, অমুকের পুত্র।' আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ﴾

"তোমরা তাদেরকে তাদের পিতার নামেই ডাকো; এটাই আল্লাহর নিকট অধিক ন্যায়সঙ্গত।" *(সূরা আল-আহ্যা-ব: ৫)*

নামকরণ মূলত বংশপরিচয় ও পরিচিতি নির্ধারণের একটি বিষয়। সন্তান ধর্মের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার মধ্যে যে অধিক উত্তম দ্বীনের অধিকারী, তার অনুসরণ করবে। আর পরিচয়দান, শিক্ষা এবং 'আক্বীক্বাহ্ এসব বিষয়ের দায়িত্ব পিতার, মাতার নয়। এ কারণেই নবী (ﷺ) বলেছেন:

وُلِدَ لِيَ اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِيْ إِبْرَاهِيْمَ.

"আজ রাতে আমার একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। আমি তার নাম আমার পিতা ইব্রা-হীম (আলাইহিস সালাম)-এর নামে 'ইবরাহীম' রেখেছি।" *(মুসলিম- ২৩১৫; তুহফাতুল মাওলুদ- ১৯৭)*

দ্রষ্টব্য: ফকীহগণ নামকরণের অধিকার মূলত পিতার অধিকার হিসেবে উল্লেখ করলেও, ইসলামী আদব হলো পিতা-মাতা পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করে এমন একটি সুন্দর, অর্থবহ ও শরীয়তসম্মত নাম নির্বাচন করবেন, যাতে উভয়ের সন্তুষ্টি বজায় থাকে এবং পারিবারিক সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ন থাকে।

জিজ্ঞাসা (২৭): ***সোনা কি বাকিতে কেনা বেচা করা যাবে? আমাদের এলাকায় স্বর্ণকাররা বাকিতে সোনা বিক্রি করে। এর বিধান কি?***

মো. হাসান
রংপুর।

জবাব: সোনা, রুপা এবং মুদ্রা বিনিময় অর্থাৎ- টাকা দিয়ে ডলার বা এর বিপরীত। এগুলো বাকিতে কেনা বেচা করা হারাম, সুদ হবে। চাই পুরো মূল্য বাকি থাক বা কিছু মূল্য বাকি থাক। *(বুখারী- ২১৭৭, ২১৭৪)*

জিজ্ঞাসা (২৮): ***সন্তান মায়ের দুধ কত দিন খেতে পারবে?***

মুহসিনা
বাগেরহাট।

জবাব: আল্লাহ তা'আলা শিশুকে পূর্ণ মেয়াদে দুধ পান করানোর সময় দুই বছর নির্ধারণ করেছেন। *(সূরা আল-বাক্বারাহ: ২৩৩)*

ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "মহান আল্লাহর বাণী: 'পূর্ণ দুই বছর, যারা দুধপান সম্পূর্ণ করতে চায়' এটি প্রমাণ করে যে, দুই বছরই দুধপানের পূর্ণ মেয়াদ। এরপর যা হবে, তা আর দুধপানের বিধানের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং অন্যান্য খাদ্যের মতো একটি খাদ্যমাত্র।" *(মাজমুআ ফাতাওয়া- ৩৪/৬৩)*

ইমাম কুরতুবী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: "দুই বছরের বেশি বা কম সময় দুধ পান করানো তখনই বৈধ, যখন এতে শিশুর কোনো ক্ষতি না হয় এবং পিতা-মাতা উভয়ের সম্মতি থাকে।" *(তাফসিরে কুরতুবী- ৩/১৬২)*

ফাতাওয়াহ লাজনা দায়েমাহ'র আলেমগণ বলেন: "যেহেতু দুধপান শিশুর অধিকার এবং তার কল্যাণের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই যদি দুই বছর পূর্ণ হওয়ার আগে দুধ ছাড়িয়ে দিলে শিশুর ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থাকে, তবে তাকে দুধ ছাড়ানো বৈধ নয়। অনুরূপভাবে, যদি দুই বছর পরও শিশুর স্বার্থে এবং ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য মায়ের দুধ পান করানো প্রয়োজন হয়, তবে মা দুধ পান করাতে পারবেন।"

ইবনুল ক্যায়িম (রাহিমাহুল্লাহ)'র তুহফাতুদ মাওলুদ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেন: "মা চাইলে দুই বছর পূর্ণ হওয়ার পরও তৃতীয় বছরের অর্ধেক বা তারও কিছু বেশি সময় পর্যন্ত সন্তানকে দুধ পান করাতে পারেন।" *(২১/৬০)*

দুই বছরের মধ্যে দুধপান করলে রিযাআত (দুধ-সম্পর্ক) প্রতিষ্ঠিত হয়।

দুই বছর অতিক্রম করার পরও শিশুর প্রয়োজনে দুধ পান করানো বৈধ।

জিজ্ঞাসা (২৯): ***পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর সূরা আল-ইখলা-স, আল-ফালাক্ব, আন্-না-স কতবার করে পড়তে হবে?***

মো. বেলাল
মানিকগঞ্জ।

জবাব: পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর উল্লিখিত সূরাগুলো একবার করে পড়তে হবে। *(আবূ দাউদ- ১৩৬৩; নাসায়ী- ১৩৩৬)*

তবে সকাল সন্ধ্যায় তিনবার করে। *(আবূ দাউদ- ৫০৮২, হাসান)*

জিজ্ঞাসা (৩০): ***নৌযানে আরোহণের সময় "বিস্‌মিল্লাহি মাজরেহা ওয়া মুরসাহা ইন্না রব্বি লাগফুরুর রাহীম" দু'আ পড়া হয়। এটা কি হাদীস সম্মত?***

মো. রুহুল
বন্দর, নারায়ণগঞ্জ।

জবাব: উক্ত 'আমল হাদীসসম্মত না। কেননা উক্ত দু'আ পড়ার বিষয়ে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা জাল বা বানোয়াট। *(সিলসিলা য'ঈফাহ্- হা. ২৯৩২)*

সুতরাং নৌযানে আরোহণের বিশেষ কোনো দু'আ নেই। স্বাভাবিক সফরে ও বাহনে আরোহণের দু'আই পড়তে হবে। আল্লাহু আ'লাম।

تعريف الغلاف / প্রচ্ছদ পরিচিতি

কলম্বিয়ান মুসলিমদের মিলনস্থল মসজিদ 'উমার

আবু ফাইয়ায জি. রহমান

কলম্বিয়ার মাইকাও (Maicao) শহরে অবস্থিত একটি প্রধান ইসলামী উপাসনালয় এবং দেশটির অন্যতম বৃহৎ ও সুপরিচিত মসজিদ। এটি কলম্বিয়ার মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয়, শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। মসজিদটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ এটি কলম্বিয়ায় আরব অভিবাসীদের ঐতিহাসিক উপস্থিতি এবং ইসলামী সংস্কৃতি বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়।

অবস্থান: মসজিদটি কলম্বিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মাইকাও (Maicao) শহরে অবস্থিত। শহরটি লাগুয়াজিরা (La Guajira) বিভাগের অন্তর্গত এবং ভেনেজুয়েলা সীমান্তের নিকটে অবস্থিত। দীর্ঘদিন ধরে মাইকাও বাণিজ্য, আন্তঃসীমান্ত যোগাযোগ এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগত অভিবাসীদের বসতির জন্য পরিচিত। এই কারণে শহরটিতে কলম্বিয়ার অন্যতম বৃহৎ মুসলিম সম্প্রদায় গড়ে ওঠে।

ইতিহাস: বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে বিশেষত বর্তমান লেবানন, সিরিয়া এবং ফিলিস্তি অঞ্চল থেকে বহু আরব অভিবাসী কলম্বিয়ায় এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মাইকাও শহরে বসবাস শুরু করেন এবং পরবর্তীকালে স্থানীয় বাণিজ্য ও সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

এই ক্রমবর্ধমান মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে উমার মসজিদ নির্মাণ করা হয়। মসজিদটির নাম ইসলামের দ্বিতীয় রাশিদুন খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব-এর স্মরণে রাখা হয়েছে, যিনি স্প্যানিশ ভাষায় সাধারণত "'উমার" (Omar) নামে পরিচিত।

স্থাপত্য: 'উমার মসজিদের স্থাপত্যে মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহ্যবাহী ইসলামী রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। মসজিদটির প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে–

- ✓ একটি সুউচ্চ মিনার, যা শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে দৃশ্যমান।
- ✓ বিস্তৃত প্রধান সলাতের হল, যেখানে একসঙ্গে বহু মুসল্লি সালাত আদায় করতে পারেন।
- ✓ বৃহৎ গম্বুজ এবং ইসলামী জ্যামিতিক অলংকরণ।
- ✓ খিলানযুক্ত প্রবেশপথ ও প্রশস্ত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ।
- ✓ পুরুষ ও নারীদের ইবাদতের জন্য পৃথক ব্যবস্থা।

মসজিদটির নকশায় কার্যকারিতা ও নান্দনিকতার সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়, যা একে কলম্বিয়ার অন্যতম উল্লেখযোগ্য ইসলামী স্থাপত্যে পরিণত করেছে।

ধর্মীয় ও সামাজিক ভূমিকা: ওমর মসজিদ কেবল দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের স্থান নয়; এটি স্থানীয় মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডেরও কেন্দ্রবিন্দু। এখানে নিয়মিত–

- ✓ জুমু'আর সালাত,
- ✓ রমাযান মাসের তারাবির সালাত,
- ✓ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার জামা'আত,
- ✓ কুরআন শিক্ষা,
- ✓ ইসলামী শিক্ষা কার্যক্রম,
- ✓ ধর্মীয় আলোচনা ও সেমিনার,
- ✓ আন্তঃধর্মীয় সংলাপ এবং সামাজিক কল্যাণমূলক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। ফলে মসজিদটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি একটি সক্রিয় কমিউনিটি সেন্টার হিসেবেও ভূমিকা পালন করে।

সাংস্কৃতিক গুরুত্ব: 'উমার মসজিদ কলম্বিয়ার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক। এটি দেশটিতে আরব ও মুসলিম অভিবাসীদের ঐতিহাসিক অবদান, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং সামাজিক সংহতির সাক্ষ্য বহন করে। মাইকাও শহরে আরবি ভাষা, ইসলামী সংস্কৃতি এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশে মসজিদটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

পর্যটন ও দর্শনীয় গুরুত্ব: ধর্মীয় উপাসনালয় হওয়ার পাশাপাশি ওমর মসজিদ স্থাপত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে আগ্রহী দেশি-বিদেশি দর্শনার্থীদের কাছেও আকর্ষণীয়। এর সুউচ্চ মিনার, মধ্যপ্রাচ্যপ্রভাবিত স্থাপত্য এবং মাইকাও শহরের বহুসাংস্কৃতিক পরিবেশ একে কলম্বিয়ার অন্যতম দর্শনীয় ইসলামী স্থাপনায় পরিণত করেছে।

গুরুত্ব: 'উমার মসজিদকে কলম্বিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী স্থাপনাগুলোর একটি হিসেবে গণ্য করা হয়। এটি দেশটির মুসলিম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় পরিচয়ের প্রতীক হওয়ার পাশাপাশি দক্ষিণ আমেরিকায় ইসলামের ইতিহাস, আরব অভিবাসন এবং সাংস্কৃতিক বহুত্ববাদের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। মসজিদটি প্রমাণ করে যে কলম্বিয়ার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মুসলিম সম্প্রদায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী অবদান রেখে এসেছে।

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক

হজ্জ বুকিং চলছে...

ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়

অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত

আমাদের বৈশিষ্ট্য:

- রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
- সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্জ, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
- হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
- প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
- হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
- হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
- খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।

স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫

মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস

MEMBER
ATAB
MEMBER

সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮

হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)

বগুড়া অফিস: ফতেহ আলী মসজিদের ২য় তলা বগুড়া মোবা: ০১৭১২-১১৫১১৫

মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬

www.holyairservice.com holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk. 25.00

কুরআন ও সুন্নাহর পতাকা তলে
ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন আমাদের নিরন্তর প্রয়াস

জাহেলিয়াতের বুনিয়াদ
মোরা ভাঙ্গবোই

কেন্দ্রীয় কর্মী সম্মেলন ২০২৬

০৬ আগস্ট'২৬
বৃহস্পতিবার
সকাল ৯ টা

স্থান
আইডিইবি ভবন
১৬০/এ ভিআইপি রোড
কাকরাইল, ঢাকা

প্রধান অতিথি

অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস ও
প্রধান পৃষ্ঠপোষক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

আমন্ত্রিত মেহমানবৃন্দ

বরেণ্য উলামায়ে কেরাম, শিক্ষাবিদ এবং জমঈয়ত ও শুব্বানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

সভাপতি

মোঃ আব্দুল্লাহীল হাদী

কেন্দ্রীয় সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

info.shubbanbd@gmail.com
৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
মোবাইল : ০১৭৬৫-৮১২২৬১
www.shubbanbd.org

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত